প্রকাশক :
প্রবীর মিত্র
সাহিত্য প্রকাশ
৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
বিভূতিভূষণ কয়োড়ী
কয়োড়ী প্রেস
২৭, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট :
শচীন বিশ্বাস

ছয় টাকা

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক—

শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য

মান্যবরেষু—

এই লেখকের লেখা

প্রিয়ংবদা : কাব্য

অভিষেক : উপন্যাস

এক

"—এমনি করেই সুলেখার জীবনে অনেকগুলো দিন, জীবনের পাতা থেকে ঝরে পড়ে গেল, যেমন করে শীতের শেষে গাছের পাতাগুলো মাটিতে একটি একটি করে খসে পড়ে, ঠিক তেমনি। যৌবনের আরক্তিম আভা এখন বেশ খানিকটা ম্লান হয়ে এসেছে; প্রাণের উদ্দাম কত কমে গেছে; থিথিয়ে পড়া জীবনে সুলেখা কাজ করে যায়। উজ্জ্বল আবার ফিরে এসেছে; তার প্রাণময় চেষ্টায় পল্লীর শিল্প-সংগঠনী আবার চলতে শুরু করেছে। এ চলা চাকা-ভাঙ্গা রথের সারথির প্রাণপণে টেনে নিয়ে যাওয়া। সুলেখা কাজ করে, প্রাণহীন কায়া—শিল্প-সংগঠনীর কাজ করে যায়।"

উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠে সুবিমল বলে,—জ্যাঠাবাবু, অপূর্ব, এমন আর কখনও শুনিনি, প্রকাশ করেন না কেন? এত লিখেছেন, তবু কেউ চিনল না আপনাকে। কেন এমন হল?

নন্দগোপাল এত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল না। প্রথম জীবনের দিনগুলো এমন করে আবার যে মনে পড়ে যাবে নন্দগোপাল প্রথমে বুঝতে পারেনি। উপন্যাসের প্রতিটি কথায় জীবনের কত সংঘাতময় মুহূর্ত জমা করা আছে। প্রবাসী-জীবনে যখন একা একা কেটেছে, সুবিমল যখন পৃথিবীর আলো দেখেনি, তখন অমৃতসরের এই নির্জন সহরে বসে জীবনেব স্মৃতির পাতা মন্থন করে সে লিখেছিল পাতার পর পাতা। কেই বা শুনতো নন্দগোপালের বন্ধনমুক্তির ইতিহাস, কেই বা জানতো বাংলার নরম মাটির ছোঁয়া এড়িয়ে এই শুক্‌নো মরুভূমির দেশে পাড়ী জমানর সকরুণ কাহিনী। প্রৌঢ় নন্দগোপাল ক্ষনেকের জন্যে পিছনের দিকে ফিরে যায়।

নন্দগোপালের কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালটা কেটেছে কলকাতায়; নন্দগোপালের কবিমনে সঙ্গীতানুরাগ প্রবল ছিল, গান গাইতে, গান শুনতে ভালবাসতো সে। বয়স যখন কম ছিল, তখন আর পাঁচজনের মত সংঘ গড়া, সরস্বতী পূজার চাঁদা তোলা নন্দগোপাল সামাজিক কাজের একটা অঙ্গ বলে মনে করতো। তাইতো মধ্যবিত্ত আর ডকের কুলি-বস্তিতে ঘেরা ছোট এই পল্লীতে, যে পল্লীতে নন্দগোপালের জীবনের প্রথম দিনগুলো কেটেছিল; সঙ্গীত আর অভিনয় শিক্ষার জন্যে সেখানে সে গড়ে তুললো নতুন একটা সংঘ। নাম দিল 'সুর-মঞ্জিল'।

'সুর-মঞ্জিল' গড়ার পেছনে সে একজনের প্রাণময় সহযোগিতা পেয়েছিল। অর্থ দিয়ে দৈহিক পরিশ্রম দিয়ে সেই সহযোগী 'সুর-মঞ্জিল'কে একান্ত আপনার করে নিল; নন্দগোপাল, এখন বাইরের, অন্দরে প্রবেশের যেন আর কোন অধিকার তার নেই, সংঘের আগাছা হয়েও তবু নন্দগোপাল সংঘ ত্যাগ করতে পারেনি; তার তিনটি কারণ। একটি সঙ্গীতানুরাগ, দ্বিতীয়টি কঠিন পরিশ্রম। 'সুর-মঞ্জিল'কে গোড়ে তোলার পর তাকে ত্যাগ করার মত মানসিক আঘাত নন্দগোপাল সহ্য করতে পারতো না, আর তৃতীয়টি হ'ল এই সংঘ গড়ার মাধ্যমে নন্দগোপাল আবিষ্কার করেছিল তার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী শিখা মিত্রকে।

কমনীয়তার পরিবর্তে রুক্ষতা বুঝি নন্দগোপালকে বেশী আকর্ষণ করেছিল। শিখার কমনীয়তা ছিল একটু কম, রুক্ষতা বেশী ছিল তার কারণ যে কি আজও নন্দগোপাল তা বুঝে উঠতে পারেনি শিখার কাছে কোন দিক দিয়েই নন্দগোপাল অযোগ্য ছিল না, অযোগ্যা ছিল শিখা। নন্দগোপালতো তাকে গ্রহণ করবে বলেছে, মনের মণিকোঠায় শিখাকে যে আসন নন্দগোপাল দিয়েছে, পৃথিবীতে কারও-শক্তি নেই সেখানে ফাটল ধরায়। নন্দগোপাল বরণ করেছে শিখাকে।

যে ভদ্রমহিলাটি 'সুর-মঞ্জিল' গড়ে তোলায় নন্দগোপালকে সহযোগিতা করেছিল, নন্দগোপাল তাকে ঘৃণা করে। তিল তিল করে গড়া এই মনের ময়ূরকে এমন করে কেড়ে নেওয়াকে নন্দগোপাল কোন দিন সমর্থন করতে পারেনি, কিন্তু শিখা ছিল তার একান্ত প্রিয়; যাকে নন্দগোপাল ঘৃণা করে, শিখা তাকে ভালবাসে; নন্দগোপাল বারবার বাধা দিতে গিয়েও ফিরে আসে, মনের আগুন তুঁষের আগুনের মত ধিক্ ধিক্ করে জ্বলে।

"সুর-মঞ্জিল"-এ রবীন্দ্রনাথের "রাজা" অভিনয় হবে। সহযোগী মহিলাটির বিরাট হলঘরে মঞ্চ সাজান হয়েছে। সংঘের পক্ষে যারা অভিনয় করবে তারা একে একে উপস্থিত হল, শিখা নেমে এলো দোতলার সিঁড়ির রেলিং ঘেঁসে বিজনের একটা হাত বাঁ কাঁধের উপর টেনে নিয়ে সহস্র কলহাস্যের মধ্যে। শিখার রুক্ষতা কোথায়? কমনীয়তায় ভরে উঠেছে তার রক্তাক্ত ঠোঁট দুটি আর বাঁকা চোখের কটাক্ষের নীচে। নন্দগোপালের শরীরে যত রক্ত ছিল একেবার ফুসফুসে জড়ো হয়ে, ক্ষণিকের মধ্যে সারা দেহে সঞ্চারিত হয়ে যেন হিম হয়ে এলো। স্তব্ধ নন্দগোপাল ভিখারীর মত চেয়ে আছে! সব যেন শেষ হয়ে যায়।

শিখা নন্দগোপালকে দেখতে পেল না, কলহাস্যের শেষ রেশটা তখনও মিলায়নি বাতাসে, শিখা বিজনকে সঙ্গে নিয়ে গ্রীনরুমে পর্দার অন্তরালে আশ্রয় নিল।

বিজন সহযোগী ভদ্রমহিলাটির একমাত্র সন্তান।

রাজা নিজেকে প্রকাশ করেন না, অন্তরালে বসে অভিনয় করে বিজন, রানীর আন্তরিকতা মনে দোলা দেয়, শিখার অভিনয়-ক্ষমতা যে এত ভাল, নন্দগোপাল আগে তা জানতো না; মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে হল। আবার ভয়ও হল বেশ, অভিনেত্রী শিখা মিত্র নন্দগোপালের সঙ্গে গত সাতটি বছর ধরে অভিনয় করেনি তো! না নন্দগোপাল নিজের মনকেই নিজে সান্ত্বনা দিতে

চেষ্টা করলো, নীল খামে মোড়া শিখার লেখা চিঠিগুলোর কিছু কিছু অংশ আবার স্মরণের মধ্যে আনবার চেষ্টা করে দেখলো, ভুলতো নন্দগোপাল করেনি, আকুলিতার প্রেম নিবেদন বারবার মনে পড়ে গেল।

বিরহী রানীর মালা নিয়ে দাঁড়ানো, যেন কবিতার একটা ছন্দ।

নন্দগোপাল আবার নিজেকে ধন্য মনে করলো, শিখার প্রাণঢালা ভালবাসায় নিজেকে মনে মনে বিলিয়ে দিল নন্দগোপাল।

অভিনয় শেষ হয়ে গেছে।

আবেগময় ভাষায় নন্দগোপাল অভিনন্দন জানাতে গেল শিখাকে ; গ্রীনরুমের পর্দা সরে গেল, অন্তরাল প্রকাশ হয়ে পড়ল ; স্তব্ধ নন্দগোপাল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না, বজ্রাহত নন্দগোপাল মনে মনে ভাবল এও কি সম্ভব, মঞ্চের রাজা, মঞ্চের রানীকে আদর করে চুম্বন করছে !

আবেগময় ভাষা মুক হয়ে গেল, সহ্য করতে পারল না নন্দগোপাল। ছুটে চল্‌ল প্রাণহীন প্রান্তরে, যেখানে গভীর অন্ধকারের মাঝে ক্রেনের আলোগুলো আকাশের তারার মত মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বলে, ডকের এলাকা শেষ হয়ে গেছে, দূরের নির্জীব জাহাজখানার একটানা গোঙানীর শব্দ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে।

সেদিন খুব খানিকটা কাঁদল নন্দগোপাল। সব যেন শেষ হয়ে গেছে, কি যেন নেই !

বুকের ভেতর কেমন একটা অব্যক্ত ব্যথা। ক্রেনের আলোর দিকে চেয়ে থাকে সে, মন নেই, ভাবার চেয়ে না ভাবার গভীরতায় নন্দগোপাল একান্ত মগ্ন।

নন্দগোপালের পিতা ব্যবসার খাতিরে অমৃতসরে এসে বাসা বেঁধেছেন। নন্দগোপালকে ব্যবসায় মন দিতে তিনি বারবার অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন। নন্দগোপাল সে চিঠির উত্তর এড়িয়ে গেছে, বহুবার বলেছে অমৃতসর তার ভাল লাগে না ; সামাজিক জীব হয়ে

অত একা একা থাকতে পারবে না সে সেখানে। আজ অমৃতসর নন্দগোপালের কাছে যেন স্বর্গের সুষমা নিয়ে উপস্থিত হল, একদিন যাকে.ভাল লাগেনি আজ তাকে আঁকড়ে থাকতে চাইল, কলকাতা তার কাছে শ্মশানের মত নিষ্প্রাণ বলে মনে হল। এখানের বাতাস বিষিয়ে গেছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। যান্ত্রিক-শহরে প্রাণের স্পর্শ পেল না নন্দগোপাল। প্রেমেব আবেদন আজ ব্যর্থ!

জাহাজখানার গোঙানীর শব্দের সঙ্গে তাল রেখে ঝিঁ ঝিঁ পোকাও ডেকে চলেছে। রাত কত হল আন্দাজ করতে পারেনি নন্দগোপাল।

'সুর-মঞ্জিলের' সহযোগী আর কেউই নন্দগোপালের কোনও সন্ধান পেল না।

নন্দগোপালের চোখের পাতা দুটো আজও জলে ভরে এলো। সুদীর্ঘ জীবনের অনেকগুলো দিন এই নিরালায় কেটেছে; বহুদিন এমন করে অতীতকে তার মনে পড়েনি; এমন করে আর কখনও ফেলে-আসা দিনগুলো মনের অবচেতনে সাড়া দেয়নি। সুবিমলের সামান্য দুটো কথা, "কেন এমন হল?" নন্দগোপালকে কোথায় টেনে নিয়ে গেল। মানস দেউলে একটা একটা করে সমস্ত ঘটনা-গুলো জড় হয়ে ক্ষণিকের জন্যে কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে টেনে নিয়ে এলো।

উপন্যাসের পাতার দিকে আবার চেয়ে রইল নন্দগোপাল, লেখাগুলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। বাঁকা বাঁকা অক্ষরগুলো একটার পর আর একটা করে যেন আঁকড়ে ধরে কাঁপছে।

স্তব্ধ সুবিমল রায় নির্বাক বিস্ময়ে নন্দগোপালের ভাবাবেগের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার ভাষাও মূক হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবছে—মানুষের কোথায় যে কি লুকোন আছে, কে জানে! না জেনে সে এমন একটা জায়গায় আঘাত করল, যেখানে নন্দগোপালের ক্ষতটা আজও গভীর। মনে মনে কথা বলার অপরাধে অপরাধী মনে করল নিজেকে।

খাতার পাতা থেকে চোখ টেনে নিয়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে নন্দগোপাল জানাল—যৌবন থেকে শুরু করে বার্ধ্যকের দোর-গোড়ায় এসে পৌঁছেছি—এতগুলো দিন বাংলার বাইরেই কেটে গেল ; প্রকাশের ইচ্ছে কোনও দিনই ছিল না, মাঝে মাঝে বাবার অনুরোধে কয়েকটা লেখা কাগজে যে পাঠাইনি তা নয়, তবে জানিসতো, কলকাতা অতবড় সহর, লেখক আছে প্রচুর, তদ্বিরের অভাবে অনেক লেখাই প্রকাশ পায়নি। কলকাতার কোলাহল-মুখর জীবনের পরে যখন এই একটানা একলা জীবন অসহ্য হয়ে উঠতো, উপন্যাসের খাতাগুলোই তখন আমায় নির্জন প্রবাসী-জীবনে সান্ত্বনা দিতো। একা একা বসে স্মৃতির পাতা মন্থন করে লিখে যেতুম পাতার পর পাতা, কেউ এ কাহিনী শুনতো না, শোনাবার ইচ্ছেও আমার ছিল না, এ কাহিনী একান্ত নিজের, তাই নিজের কাছেই একে রেখেছিলুম মনের আল্‌মারিতে যত্ন করে সাজিয়ে। জীবনে যা কিছু দেখেছি, যা কিছু এই ছোট্ট মনটা দিয়ে উপলব্ধি করেছি, সবই ওই উপন্যাসের খাতায় জমা করা আছে। আমার জীবনের ব্যক্তিগত ঘটনা, আর কারও ভাল লাগবে কিনা জানিনা, লেখা আমার 'হবি' তাই লিখে যাই।

—এবার প্রকাশ করুন, বহুদিন কলকাতায় যাইনি, এবারে কলকাতার প্রতিটি প্রকাশকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে চেষ্টা করে দেখি, নিশ্চয় কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে আসব। বাংলাদেশের বহু লেখকের লেখাই পড়েছি, এমন করে কোন লেখাই আমার মনকে নাড়া দিতে পারেনি, এমন করে প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি পরিবেশে আর কেউ ফুটিয়ে তুলেছে বলে আমার মনে হয় না। এ লেখা আপনি যদি প্রকাশ না করেন, আপনার মাতৃভূমিকে ফাঁকি দেওয়া হবে। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির জন্যে আপনার যে একটা বিরাট দান আছে, একথা সকলকে জানিয়ে দিন। আর পাঁচজনের মত পৃথিবীতে জন্মে বৃথাই যে দিনগুলো আত্মসুখের অন্বেষণে কেটে যায়নি, ভাষা সংস্কৃতির

মান উঁচুস্তরে তুলতে আপনি যে জীবনের মহামূল্য দিনগুলো কাটিয়ে দিলেন, সমাজকে তা জানতে দিন, বাংলা দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডি কাটিয়ে আপনার লেখায় যে মহাভারতের স্পর্শ আছে তা প্রকাশ করে দিন, লেখা শুনে মনে হল এ যুগের মনিষীদের মধ্যে আপনিও একজন। এমন করে নিজেকে বঞ্চনা করবেন না। প্রকাশকেরা বই যদি আপনার পড়ে, অবহেলা করার সাধ্য তাদের যে থাকবে না এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

কথা বলার মাঝে মাঝে সুবিমলের মনে যে রহস্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভাষার মধ্যে তার প্রকাশ পেল না। আনন্দে উত্তেজনায় তার মুখ মাঝে মাঝে দীপ্ত হয়ে আবার সে দীপ্তি মিলিয়ে যাচ্ছিল, একটা কঠিন ভাব মনের মাঝে যে উঁকি দিয়ে ফিরছিল, ম্লান মুখে কপালের উঁচু শিরাগুলো মনের এ ভাবকে প্রকাশ করছিল ক্ষণে ক্ষণে। রহস্যের যবনিকা সুবিমল, নন্দগোপালের কাছে উন্মোচন করেনি, সুবিমলের পরিকল্পনা সুবিমল মস্তকের বুদ্ধি-কক্ষে জমা করে রাখল।

বৃদ্ধ নন্দগোপাল সুবিমলের কথায় চঞ্চল হয়ে উঠলো, এমন করে তো কেউ নন্দগোপালকে মুক্তিপথ দেখায়নি, অন্ধকারে আলোক-বর্তিকা নিয়ে এমন করে তো কেউ পথের সন্ধান দেয়নি। অন্ধকারেই নন্দগোপালের সোনালী দিনগুলো কেটেছিল, মর্মহীন ব্যর্থতায় যৌবন হয়েছিল জর্জরিত। বাসনার রক্তিম আর্ততা হৃদয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। নন্দগোপালের মনের রক্তরূপ ক্রমে ক্রমে গৈরিক বসন বরণ করেছে, ব্যর্থতায় অনুরাগী আর্তমন বিষাক্ত সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছে। নন্দগোপালকে পথের সন্ধান দেবে কে? নন্দগোপাল তো নিজেকে প্রকাশ করেনি, তিল তিল করে জমা করে রেখেছে তার জীবনের ইতিহাস ওই উপন্যাসের ময়লা পাতায়। আজ নন্দগোপাল জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় পাঁচখানি পাণ্ডুলিপি সুবিমলের হাতে তুলে দিল, বললে—আমার গহন অন্তরে, জীবন-ঘন

অবচেতনার আড়ালে যাকে এতদিন জমা করে রেখেছি, আজ তাকে তুলে দিলুম তোর হাতে, বন্ধুর ছেলে তুই, ছেলেবেলা থেকে একটু একটু করে মানুষ করে এত বড় করেছি, লেখাপড়া শিখেছিস্। দার-পরিগ্রহ করলে এত বড় ছেলেই আমার হতো, বাবার মত মানুষ করেছি, একদিনও জানতে দিইনি তুই আমার ছেলে নস্। তোর জীবনের কোন অভাবই আমি অপূর্ণ রাখি নি। বাবা মারা যাবার আগে তিনি যা কিছু আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তোকে মানুষ করার জন্যে সবইতো আমি ব্যয় করেছি। তোর কাছে নিজেকে অভিন্ন মনে করেছি। তোর হয়তো কর্ত্তব্য বোধ জন্মেছে, এই বৃদ্ধ জ্যাঠার শেষ জীবনে তার প্রতিষ্ঠা হয়তো তাঁকে দেখিয়ে যেতে দিতে চাস্; বেশ তাই হোক্। তোর ইচ্ছে যদি সফল করতে তোর মন চায়, দেখ কতদূর কি করতে পারিস্। জানিনা কতদূর সফল হবি। মানুষ কত কি গড়ার স্বপ্ন দেখে, সবই কি সফল হয়? হয় না, কেন হয় না জানি না, Man proposes God disposes এই তো শুনে আসছি।

দুই

পাঁচখানা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ নন্দগোপালকে প্রণাম করে সুবিমল, নন্দগোপালের ছোট্ট বাগানটি পার হয়ে পথে নেমে এলো, টাঙাওয়ালা ছোট সুটকেশটি সুবিমলের হাত থেকে তুলে নিয়ে নিজের পাশে রাখল। নন্দগোপাল বাগানের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্বজল চোখে সুবিমলকে বিদায় দিলেন। টাঙা এগিয়ে চল্‌ল—অনেকদিন পরে নন্দগোপাল আবার একা। আপন ছেলেকেও কেউ বোধহয় এত ভালবাসে না, এত স্নেহ করে না, নন্দগোপালের হৃদয়টা আজ সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল. যেমন করে ফাঁকা হয়েছিল মানসী শিখা মিত্রকে হারিয়ে। রাস্তার বাঁকে টাঙাটা একটু একটু করে মিলিয়ে গেল। নন্দগোপাল বাগান পেরিয়ে দালানের ইজি চেয়ারটায় একবার গা-টা এলিয়ে দিল, মনের দ্বারে উঁকি দিতে লাগল জীবনের কত ঘটনা—সুবিমলকে পাওয়ার কথা। নন্দগোপাল চঞ্চল হয়ে উঠল, ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌ল স্বর্ণমন্দিরের দিকে, গুরু নানকের ভক্ত পাঞ্জাবী স্ত্রী-পুরুষ যেখানে মনের শান্তি আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ছুটে যায় ; সেখানে নন্দগোপালের বিক্ষিপ্ত মন একটু থিথিয়ে পড়ে। স্নিগ্ধ পরিবেশে সেও শান্তি পায় বেশ খানিকটা।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে স্বর্ণমন্দির এক স্বর্গের ইন্দ্রপুরী বলে ভ্রম হয়, দীপান্বিতা স্বর্ণমন্দির পার্থিব দুঃখ বেদনাকে ম্লান করে দেয় ; মন্দিরের পেছনে নিরিবিলিতে একা একা বসে নন্দগোপাল ফেলে-আসা জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা, বেদনাকে একবার স্মরণ করে নেয়। মন্দিরের নিঃসঙ্গ পরিবেশে নন্দগোপাল তখন জীবনটাকে অঙ্কের খাতায় ফেলে বিচার করছিল। যোগ বিয়োগের পরে যখন শূন্যটা বড় হয়ে মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে বেদনার করুন রাগ বাজিয়ে চলেছে,

তখনই নন্দগোপালের পিতার ব্যবসায়ী এক পাঞ্জাবী বন্ধু সুবিমলকে কোলে নিয়ে নন্দগোপালের পাশে দাঁড়িয়ে যা বলছিল, তার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়াবে—বাঙালীর ছেলে এ, আপনারই বন্ধু ইন্দ্রজিৎ রায়ের ছেলে। গতকাল এর বাবা ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে। বেচারার কেউ নেই। শুনেছি বিদেশে বাঙালীলোক বড় ভাল, বাঙালীর দুঃখে বাঙালী চুপ করে বসে থাকে না। আপনি এর প্রাণ বাঁচান। বাঙালীর ছেলে পাঞ্জাবের সহরে একটু দুধের জন্যে কাঁদবে, একজন বাঙ্গালী হয়ে আপনি এ সহ্য করবেন কেমন করে? আমি পাঞ্জাবী হয়ে জোড় হাত করে বলছি একে গ্রহণ করুন। আমার সামর্থ্য নেই, থাকলে আমিই একে নিতাম।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ নন্দগোপালকে বিচলিত করে তুলেছিল, প্রথমে কথা বলার মত ভাষা নন্দগোপালের ছিল না, তাই এই পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে এতগুলো কথা বলে যেতে হল!

সম্বিত ফিরে পেয়ে নন্দগোপাল সুবিমলকে প্রায় কেড়ে নিয়ে ছুটেছিল দূরের একটা মিষ্টির দোকানে। নন্দগোপাল জানত সেখানে দুধ পাওয়া যায়; মাটির একটা ভাঁড়ে নন্দগোপাল সুবিমলকে ঠিক মায়ের মত একটু একটু করে দুধ খাওয়াল।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি যিনি নন্দগোপালের কাছে এসেছিলেন, এতক্ষণ পরে নন্দগোপালের পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—ক্ষমা করুণ নন্দগোপাল বাবু, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলুম, ভেবেছিলুম আপনি কি নিষ্ঠুর! এত বলছি, তবুও আপনি বাচ্চাকে কোলে তুলে নিচ্ছেন না কেন? তখন ভাবিনি যে ইন্দ্রজিৎ বাবুর মারা যাওয়ার খবর শুনে আপনি একেবার মুষড়ে পড়েছেন।

নন্দগোপাল আবার স্তব্ধ হয়েছিল, বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল—ইন্দ্রজিৎ মারা গেল আমি তো জানিনা। কেউ আমায় একটা খবরও দিল না কেন? অমৃতসরে বাঙালী কি মরে গেছে? আজও তো বেঁচে আছি আমি।

সুবিমল চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল, নন্দগোপাল তার দিকে ফিরে চাইল।

•পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি মন্দিরের অপরপ্রান্তে জনতার স্রোতে কোথায় মিলিয়ে গেলেন, নন্দগোপাল আর কখনও তার দেখা পাননি!

স্বর্ণমন্দিরের এ প্রান্তে এসে কতবার সুবিমলের কথা মনে হয়েছে। সুবিমলকে পাওয়ার ক্ষণটা নন্দগোপালের এখনও স্পষ্ট মনে আছে। পঁচিশটি বছর আগেকার ছোট একটা ক্ষণ নন্দগোপালের কাছে একমাস আগেকার ঘটনা! জীবনের কত ঘটনা একটি একটি করে পার হয়ে গেল, জীবনের সায়াহ্নে এসে আজও একটা লোককে তার মনে হয়, যে সুবিমলকে তার হাতে তুলে দিয়েছিল; মন্দিরের এ প্রান্তে এসে অনুসন্ধানী চোখ বারবার সকলের উপর দৃষ্টি মেলে, দিনের পর দিন এখানে প্রতীক্ষা করে চলে নন্দগোপাল, কিন্তু সেই পাঞ্জাবীর সন্ধান সে আর পায় না। নিঃস্ব জীবনের আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি, দারপরিগ্রহ না করে সন্তানের পিতা হয়েছিল নন্দগোপাল, কিন্তু যাঁর দয়ায়, তিনি আজ কোথায়? হয়তো পৃথিবীর আলোয় আর তাঁকে দেখা যাবে না, তবুও নন্দগোপাল প্রতীক্ষা করে থাকে।

সুবিমলের টাঙা এসে উপস্থিত হল স্টেশনের পাশে ছোট্ট একটা হোটেলের গা ঘেঁসে।

সুবিমল এটাচিটা সঙ্গে নিয়ে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার বারান্দায় চলে এলো। বারান্দার একটা কোণে এসে বড় বেতের চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিল সে. রাস্তার দিকে মুখ ফিরে বসলো। বাবুর্চি এসে কি দেবে জিজ্ঞাসা করায় সুবিমল মাংস আর চাপাটি দিতে বলে দিল; অটোরিক্সা, বাস, টাক্সি, টাঙা আর সাইকেলের স্রোত বাঁকা সরিসৃপের মত নিকোশ-কালো রাস্তার পিঠে বয়ে চলেছে। সুবিমলের দৃষ্টি রাস্তার দূরের একটা বাঁকে যেখানে ছোট

একটা গলি 'বারে'র পাশ থেকে সোজা স্বর্ণমন্দিরের দিকে চলে গেছে সেখানে নিবদ্ধ ছিল ; সে ভাবছিল, তার জীবনের পঁচিশটা বসন্ত ওই বৃদ্ধ নন্দগোপালের সংকীর্ণ গণ্ডীতে ঝরে গেছে। সুবিমল চেয়ার ছেড়ে হোটেলের সংলগ্ন বারের কাউন্টারে গিয়ে তিন পেগ্ রাম, সোডায় স্পঞ্জ করে গলায় ঢেলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালী থেকে শুরু করে বুকের তলদেশ পর্য্যন্ত একবার জ্বলে উঠে মাথার মধ্যে ঝিম্ ধরিয়ে দিল।

আবার বারান্দায় বেতের চেয়ারটা টেনে নিয়ে ক্ষণিকের জন্যে আত্মমগ্ন হল সুবিমল ; আজ নিজেকে বেশ মুক্ত বলে মনে হল ; এতদিন পরে মুক্তির আনন্দে সে বিভোর হয়ে উঠলো। ভবিষ্যৎ জীবনের রঙিন পরিকল্পনায় সুবিমল স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা করল। অমৃতসরে ফিরে আসার ইচ্ছে মন থেকে উবে গেল, একঘেয়ে জীবনের ফাঁকে একটু বৈচিত্র্য এসেছে মনে হল। কল্পনার বিচিত্র ফানুস্ মনের আনাচে কানাচে উড়ে চল্‌ল ; বাধার গণ্ডি পার হয়ে আনন্দ-জীবনে তার যাত্রা শুরু হ'ল।

বাবুর্চি এসে খবর দিল, রাত অনেক হয়ে গেছে। সুবিমল ঘড়ির দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠলো, ট্রেনের সময় পার হয়ে গেছে অনেকক্ষন, আরও একটা ট্রেন আছে এগারটা পাঁচে। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলো নির্জন পথে কেউ নেই, বাসের ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, রিক্সার ঠুং ঠুং আওয়াজ এখন আর কিছুই শোনা গেল না। বিজলীর আলোয় কালো রাস্তাটা মৃত অজগরের মত নিশ্চুপ। এটাচিটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে সুবিমল স্টেশনে উপস্থিত হল। হাতে সময় ছিল আরও খানিকটা, একটা সিগারেট ধরাল সে ; সুবিমল ওভার ব্রীজ ক্রস্ করার সময় অমৃতসরকে এবার শেষ বিদায় জানাল, ডান হাতে এটাচিটা নিয়ে, আর বাঁ হাতে মাথার টুপিটা তুলে ধরে।

তিন

উত্তর কলকাতার একটা বড় হোটেলে সুবিমল আশ্রয় নিল। হোটেলে প্রায় সত্তরটা বেড্ আছে। সারা সহরের সমস্ত বৈচিত্র্য এই একটা মাত্র হোটেলেই দেখতে পাওয়া যায়। হোটেলের সমস্ত বোর্ডারই সুবিমলের কাছে আজব বস্তু, অদ্ভুত লাগে এদের—এদের চলাফেরা কথাবলা সুবিমলকে বিস্ময়ে হতবাক্ করে তোলে। স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সে। যেমনকরে ছোট শিশু পৃথিবীর আলো, বাতাস, গাছপালা, মানুষের চলা-বলা সবই বিস্ময়ের ডাগর চোখে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখে, সুবিমলও তেমনি করে অবাক নয়নে চেয়ে থাকে সকলের দিকে। রাতে কোলাহল যখন একটু স্তিমিত হয়ে পড়ে, পাশের ঘর থেকে থ্রী নো ট্রামস্ এর কল যখন আর শোনা যায় না, তিন তলার ক্লাসিক গান যখন বন্ধ হয়, সুবিমল উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি খুলে পড়তে বসে। খানিক পরেই বাসন ধোয়ার খস্ খস্ শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত হোটেলটা যেন রূপোর কাঠির স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়ে। সিঁড়ি আর দালানের আলোগুলো নিভে যায় একটা একটা করে। মাঝে মাঝে সুবিমল পাণ্ডুলিপি বন্ধ করে ছাদে চলে যায়, ঝির ঝিরে হাওয়া সুবিমলের মনে কেমন যেন একটা মাদকতা আনে। সারা শহরের বেশ একটা বড় অংশ এখান থেকে দেখা যায়। দূরে ময়রার দোকানে কাজ চলে প্রায় সারা রাত। আর নোংরা বস্তিটার পাশে, গলির মোড়ে রিক্সা এসে থামে, ট্যাক্সির হর্ণও মাঝে মাঝে শোনা যায় এখান থেকে।

সহরের বাকী দিকটা সুবিমলকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, নির্জনতা তাকে স্বপ্নের কল্পিত রঙ্গমঞ্চে টেনে নিয়ে যায়। মনে মনে ভাবে, ঠিক এমনি মুহূর্তে যদি কেউ তাকে ভালবাসতো, যদি কাছে

এসে বলতো,—এতদিন লুকিয়ে ছিলে কেন? আমায় কষ্ট দিতে তোমার বুঝি খুব ভাল লাগে, না? জানো না তো তোমার জন্যে কতরাত আমি রাস্তার ধারে চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দিই। কত নিষ্ঠুর তুমি!

সুবিমল সমস্ত শরীরে উষ্ণতা বোধ করে। উন্মাদের মত কাউকে কাছে টেনে নিতে চায়। কল্পনায় চুম্বনের আনন্দ অনুভব করে সে। মনে মনে ভাবে, কে জানতো নারী-বক্ষের কোমল স্পর্শে এমন বিচিত্র উন্মাদনা আছে!

কল ঘরে এসে সুবিমল চোখে মুখে খানিকটা জলের ঝাপটা দিয়ে আবার পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসে।

এমনি করে অনেকগুলো দিন চলে গেল। পাশের বোর্ডারটি সুবিমলের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন। ভদ্রলোক সুরেন্দ্রনাথ কলেজে প্রফেসারি করে হোটেলে ফিরে আসেন রাত্রি নটার মধ্যে। প্রতিদিনই এসে দেখেন সুবিমল খাতা খুলে মনোযোগ সহকারে পড়ছে। প্রফেসরের মনে অদম্য ইচ্ছে জন্মেছিল; কতবার বল্‌তে গিয়েও বল্‌তে পারেন নি,—কি পড়েন মশাই দিনের পর দিন; যেদিন থেকে এসেছেন, ওগুলো আঁকড়ে থাকতে তো দেখি দিনরাত।

কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারেননি তিনি। সঙ্কোচ এসে বাধা দিয়েছিল, মনে মনে ভেবেছিলেন, সুবিমল বাবুর হয়তো কোনও গোপন কিছু।

বহুদিনের মত একদিন পাণ্ডুলিপি বন্ধ করে সুবিমল ছাদে চলে গেছে, ফিরতে বেশ দেরী হচ্ছে। প্রফেসর লোভ সংবরণ না করতে পেরে পাণ্ডুলিপি পড়তে শুরু করেছেন।

সুবিলম ফিরে এসে দেখে প্রফেসর পড়ায় মগ্ন। সুবিমল আবার ফিরে গেল নির্জন অন্ধকারে। উপন্যাসের নায়িকা কমলাকে মনে পড়ল; পাঞ্জাবী মেয়ের ডাগর চোখ দুটো চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

তার-নিটোল যৌবন আর সুপুষ্ট স্তনের মসৃন রেখাটা সুবিমলকে আবার আনমনা করে তুল্‌ল। গভীর অন্ধকারে আলোর উপর বসে নায়িকার নিবেদন, কমলার দেশের জন্যে পুলিসের গুলিতে আত্মদানের কাহিনী সুবিমলের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুল্‌ল।

আকাশে রাতের শেষ ধ্রুব তারাটা উজ্বল হয়ে ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে এলো; রাস্তার বাতিগুলো কে যেন একে একে নিভিয়ে দিয়ে গেল।

সুবিমলের রাত-জাগা চোখে তন্দ্রার আমেজ নেমে এলো। সে ঘরে ফিরে দেখলো টেবিলল্যাম্পটার সামনে মাথাগুজে প্রফেসর এখনও উপন্যাসের পাতা উল্টে চলেছেন। সুবিমল বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে তন্দ্রালস চোখে প্রফেসরের দিকে চেয়ে রইল। নিষ্পলক দৃষ্টি প্রফেসরের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে নিবদ্ধ। বাইরের জগতের সঙ্গে এখন আর তাঁর কোনও সংযোগ নেই; মনের সংযোগ রয়েছে, নায়ক নায়িকার গতিবিধির দিকে।

সুবিমল ভাবলে; উপন্যাসের কমলা বোধ হয় এখন দেশের জন্যে আত্মদান করতে প্রস্তুত। নায়কতো বহুদিনই জেলের অন্তপুরে অসূর্যম্পশ্যা হয়ে আটকা পড়ে আছে। প্রফেসরের কতদূর হল কে জানে! রাত তো কাবার। কাল হয়তো ভদ্রলোকের ছুটি, কে-জানে। নানা প্রশ্ন, সুবিমলের মনে পড়ল—বৃদ্ধ প্রফেসরের একাগ্রতা দেখে।

সুবিমল তাকিয়ে আছে তেমনি নিষ্পলক দৃষ্টি নিয়ে।

হঠাৎ প্রফেসর চিৎকার করে উঠলেন, অপূর্ব! সত্যিই সুবিমলবাবু আপনি একজন প্রতিভাবান্ লেখক।

—আমি?

—হাঁ, হাঁ, আপনি। প্রফেসর উঠে এসে সুবিমলকে জড়িয়ে ধরে আবার চিৎকার করে উঠলেন, অদ্ভুত আপনার বচন ভঙ্গি। বাংলায় এমন একজন আজও অখ্যাত, এ চিন্তা করতেও পারা

যায় না। মনস্তত্ত্বে আপনার অদ্ভুত দখল, দূর দৃষ্টি আপনার সঠিক। বাংলা সাহিত্যে আপনি যে নতুন দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা সত্যিই সুন্দর। আপনি মহাপুরুষ সুবিমলবাবু, আপনি মহৎ। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় এখন আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এখনই কলেজের ছেলেদের জোর গলায় বলতে ইচ্ছে করছে,—ওরে বাংলা ভাষা মরেনি নতুন করে জন্ম নিচ্ছে, অনেকেই এখনও আত্মপ্রকাশ করেনি, করলেই বুঝবি, বাংলা ভাষা কত সমৃদ্ধ। মাইকেলের সেই পুরোন কথা আবার নতুন করে বলতে ইচ্ছে হয়—

"মাতৃভাষা-রূপ খনিপূর্ণ মনিজালে।"

অপ্রত্যাশিত প্রশংসা শুনে সুবিমল কেমন যেন আত্মমগ্ন হয়ে গেল, নন্দগোপালের সুখ্যাতির আগামী বিকাশ সুবিমলকে বিচলিত করে তুলল, আশাতীত এক কামনা সুবিমলকে পেয়ে বসেছে, পুরাতন গৃহের ভীত ভাঙতে এক ঘড়া মোহর যেমন নিঃস্ব গৃহস্থকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, সুবিমলকে তেমনি অযাচিত চাওয়ার নদীকূলে উব্‌ছে দিয়ে গেল প্রফেসরের কয়েকটা কথায়। অন্তরের আনন্দোজ্জ্বল সোনালী স্বপ্ন বাইরের আবরণকে প্রতিবিম্বিত করলো না ; সুবিমল বল্‌লে—আত্মপ্রকাশ করার ইচ্ছে তো আছে, সুযোগ কই, খাতার পর খাতা লিখে জমা করে রেখেছি, প্রকাশের অভাবে বাজারে না কাটলেও, দু-দিন পরে উই-এ যে কাটবে এ গ্যারান্টি আপনাকে আমি দিতে পারি।

—সেকি প্রকাশক পাচ্ছেন না, এরও প্রকাশক জোটে না, আপনি আমার প্রকাশকের কাছে চলুন, নিশ্চয় আপনার বই তারা প্রকাশ করবে। ওরা তো কিছুই বোঝে না, পাণ্ডুলিপি পড়ার চেয়ে কোন প্যাঁচে চল্‌লে বাজারে আরও কিছু তাদের বই কাটতি হবে এই চিন্তায় মগ্ন ; আমার পয়সা থাকলে কি আর রাত-জেগে লেখা বাংলার নোটগুলো ওদের কাছে মাটির দরে বেচে দিয়ে আসি ? বাঙলা উপন্যাস ছাপতে গেলেই ওরা দেখবে বাজারে এই লেখকের

বই কাটতি হয় কেমন, যদি দেখে লেখকের নাম আছে, যা ছাপা যায়, চলবে তখনই কিছু বেশী পয়সা দিয়ে স্বত্ব কিনবার তালে থাকে। আর নামহীন লেখকদের কোন পাত্তাই প্রথমে দেবে না, তারপর দর এত কম হাঁকবে যে আপনাকে বলতে হবে, দয়া করুন মশাই আমার বাজারে কাটার চেয়ে ওই উই-এ কাটাই ভাল।

আবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল; সুবিমল দু'একজন প্রকাশকের কাছে যে যায়নি তা নয়, গিয়েছিল। একজন ছাড়া আর সমস্ত প্রকাশকই সুবিমলকে লাইব্রেরীর দোরগোড়া থেকেই বিদায় করে দিয়েছে, শুধু একজন প্রকাশক সুবিমলকে কাউণ্টারে একটা টিনের চেয়ারে বসিয়ে এককাপ চা খাইয়ে বলেছিল, বইগুলো দিয়ে যান, একমাস বাদে আসবেন। পড়ে দেখি, যদি চলার মত হয়, চালাব; আপনাকে লিখে দিতে হবে বেশ কিছু পেয়েই বিক্রী করলাম। কিন্তু জানেন কি মশাই, বাজার বড় খারাপ, তার উপর নতুন লেখক, আর আমাদের Business-এর অবস্থা তো দেখছেন, পয়সা কড়ি কিছু দিতে পারব না।

নমস্কার করে সুবিমল বিদায় নিয়েছিল।

প্রফেসরের বক্তব্যের সঙ্গে সুবিমলের অভিজ্ঞতা হুবহু মিলে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে—দয়া করে যদি এ অখ্যাতকে একটু ঠাঁই করে দেন, আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো, কোন দিন ভুলবো না আপনার দান। খানপনের উপন্যাস লিখেছি, জীবনে প্রকাশ পেল না একটাও। দুঃখে ক্ষোভে লেখা প্রায় বন্ধ রেখেছি; মন কিন্তু মানে না, একটু স্থির হয়ে বসলে ওই খাতার দিকে মন টেনে নিয়ে যায়;

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা"

এই লাইনটি মনে মনে আওড়ে আবার লিখতে বসি, লিখতে ইচ্ছে হয় না, লেখাকে দমন করার জন্যে পুরোন লেখার পাণ্ডুলিপি

খুলে পড়তে বসি। পড়তে পড়তে মনে হয় সব ব্যর্থ হয়ে গেল, কিছুই করে যেতে পারলুম না, জীবনের এতগুলো দিন বৃথাই কেটে গেল। অনুশোচনা যখন খুব তীব্র হয়ে উঠে, বাইরে গিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকি, আকাশে তারার-মালার দিকে চেয়ে, মনে এক নির্মল প্রশান্তি অনুভব করি। আবার ভাবি বেশ তো হ'ল, লিখে গেলুম কেউ চিনলো না, এমনি করেই একদিন সব কিছু পেছনে ফেলে চলে যাব। যদি কেউ সন্ধান করে দেখে, দেখবে এমনি কত প্রতিভা আমাদের দেশে বিকাশের অভাবে অকালে ঝরে গেছে। হয়তো কেউ চোখের জল ফেলবে, কেউ হয়তো হাসবে।

সুবিমল চুপ করে গেল, বেশ ভাল বলা হয়েছে ভেবে মনে মনে গর্ব অনুভব করলো। ভাবলো, নন্দগোপাল রায় শুধু একাই লিখতে পারে না, সুবিমল আজকাল যা ভাবে যা বলে, লিখে গেলে নন্দগোপালের চেয়ে কোনও অংশে খারাপ হতো না। কিন্তু অত ধৈর্য কোথায়। আশার কোনও আলো নেই, সুনাম কোন দিন হবে কিনা কে জানে, সাহিত্যের আসরে কোনদিন কেউ জায়গা দেবে কিনা তারও ঠিক নেই অথচ দিনের পর দিন, রাতের পর রাত লিখে যেতে হবে পাতার পর পাতা। অত কষ্ট পাগল ছাড়া আর বোধ হয় কেউ করতে পারে না। স্টেশনের কুলিরাও কষ্ট করে, তবে পয়সার জন্যে, পয়সাও পায়, রাত্রে বিশ্রাম করে, নয়তো তাড়ি খেয়ে খুব খানিকটা স্ফূর্তি করে বেশ্যা পল্লীতে গিয়ে। তাদেরও কষ্ট স্বীকার করার একটা কারণ আছে।

কিন্তু এই লেখকগুলো কি পায়? যাদের লেখা প্রকাশ হয়েছে তারা অবশ্য প্রচুর সম্মান পায় কিন্তু যাদের হয়নি, তারা। তারা কি পায়, কিসের নেশায় দিনের পর দিন এত কষ্ট স্বীকার করে। হাসি পেল সুবিমলের, কুলিদের মত কষ্ট তাকে পেতে হল না, পাগলের মত দিনরাত তাকে জাগতে হল না, তবু সে পাবে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের যা কিছু পাওয়া উচিত সমস্তটুকুই। আনন্দে এক পাঁট রাম

পুরোই সে গলায় ঢেলে দিতে যায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় তার বলতে ইচ্ছে করে, "ময়ূরের মত নাচেরে, আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে, হৃদয় নাচেরে।"

নন্দগোপালের কথা ভেবে দুঃখ হয় সুবিমলের, বেচারা শুধু কষ্টই করে গেল। যাক, এই তো পৃথিবীর নিয়ম, আজ যারা ধনী, তাদের অধিকাংশই তো বন্ধুকে নিঃস্ব করে বড় হয়েছে। আজ যখন তারা মাস্টার-বুইকখানা গ্রাণ্ড-এর সামনে থামিয়ে ডিনার খেতে যায়, তখন কি কেউ একবারটিও সে কথা ভাবে? আর তারাই কি ভাবে? হয়তো ভাবে; তারই মত। যাক নন্দগোপাল বুড়ো হয়েছে, আর কটা দিন, এবার তো শেষ হয়ে যাবে, আর সুবিমলের সমস্ত যৌবন, সমস্ত জীবন এখনও বাকী আছে।

জীবন-যৌবন পূর্ণ করে নিতে তাকে পথ ছেড়ে দাও নন্দগোপাল। নতুনকে বিকশিত হতে সুযোগ দাও। প্রফেসর যে সুযোগ করে দিতে এগিয়ে এলো, যে কোনও প্রকারে তাকে গ্রহণ করার জন্যে সুবিমলকে পথ করে নিতেই হবে। সুবিমলের দুঃখে প্রফেসর বিচলিত হয়ে পড়লেন। বল্লেন,—আজই চলুন, সুবিমলবাবু। আগুন কখনও ছাই চাপা থাকে না।

চার

প্রফেসর সুবিমলকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ স্কোয়ারে নামকরা একটা লাইব্রেরীতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই একজন পোড় ভদ্রলোক চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন, কি ব্যাপাব মিঃ সেন? আপনি হঠাৎ নিজেই এসে উপস্থিত, প্রয়োজন যদি, একটা খবর পাঠালেই গিয়ে দেখা কবে আসতাম।

প্রয়োজন আমার তাই আমাকেই আসতে হ'ল। আপনার প্রয়োজন হলে আপনিও যেতেন।

প্রকাশক হিন্দুস্থানী চাকরকে ডেকে দু'কাপ স্পেশাল চা আনতে বলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে; ব্যাপারটা কি বলুন তো? আজ কি কলেজ বন্ধ?

—না কলেজে ডুব দিলাম।

—সে কি?

—হাঁ, ওটা আমার ধর্ম, মাঝে মাঝে একটু ডুব না দিলে ঠিক ভাল লাগে না। মেসিনকেও একটু রেষ্ট দিতে হয়, ঘড়িকেও অয়েলিং করাতে হয়। আপনাদের মোটরকেও তো সময়ে সময়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে একটু রেষ্ট দেন।

—তা যা বলেছেন, রেষ্ট মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

—সেই প্রয়োজনেই আপনার দুয়ারে আসা। এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সাহিত্যিক শ্রীসুবিমল রায়, আবার প্রকাশককে উদ্দেশ্য করে বললেন,—আর ইনি শ্রীশিশিরকুমার গাঙ্গুলী। সুবিমলবাবু যার কথা আপনাকে বলছিলাম, ইনি সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকাশক।

সুবিমল, প্রকাশককে নমস্কার করলে, শিশিরবাবু সুবিমলকে প্রতি নমস্কার করে আবার মুখ ঘুরিয়ে প্রফেসরের দিকে চাইলেন।
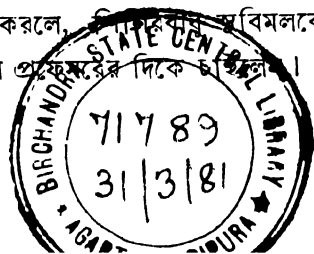
প্রকাশকের ব্যবহারে ভদ্রতার লেশমাত্র নেই, অর্থাৎ সুবিমলের সঙ্গে ব্যবহারে স্ব-হৃদয়তা প্রকাশ পেল না, সুবিমল তা ভাল ভাবেই উপলব্ধি করলে।

শিশিরবাবু বললেন,—সুবিমল বাবুর নামটা তো শোনা শোনা মনে হচ্ছে, লেখাও বোধ হয় কিছু পড়েছি।

প্রফেসর বললেন,—ইনি তো কিছু প্রকাশ করেননি। এঁর লেখা পাঁচখানা উপন্যাস আমি সঙ্গে এনেছি। আজ পর্যন্ত এঁর কোন বই প্রকাশ পায়নি। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন, ইনি বর্তমানের শ্রেষ্ঠ লেখকগোষ্ঠীর একজন। অসামান্য এঁর প্রতিভা ; লেখনিশক্তি সুবিমলবাবুর সত্যই অপূর্ব।

—ও! ইনি প্রকাশ করেননি কোনও লেখা। কিন্তু—নতুন লেখকের বই কি কেউ পড়বে! শিশিরবাবু বেশ বিব্রত বোধ করলেন।

—সত্যিকার প্রতিভাকে যাচাই করে নিতে বাংলা দেশের পাঠক-গোষ্ঠীর বেশীদিন লাগবে না। একবার একখানা প্রকাশ করে দেখুন, এই মাস্টার যে মিথ্যে বলেনি, তা কয়েকদিনের মধ্যেই টের পাবেন।

—একটু ভেবে দেখি।

—না না, আবার ভাবাভাবি কেন? অন্ততঃ আমাকে আপনাদের বিশ্বাস হয় তো!

—নিশ্চয়! নিশ্চয়! আপনার কথা কখনও আমরা অমান্য করতে পারি! তবে বুঝতে পারছেন, উপন্যাসের বাজার এখন খুব ভাল নেই, তার উপর নতুন। অতগুলো টাকা যদি আটকা পড়ে, তাই একটু চিন্তিত হতে হচ্ছে এই যা।

—অসুবিধে যদি মনে করেন তবে থাক ; দেখি পাশের ঘরে ওঁরা কি বলেন?

প্রফেসর উঠতে যাচ্ছেন, শিশিরবাবু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন ;—সেকি, উঠছেন কেন? আমি কি বলেছি প্রকাশ করব না, একটু

চিন্তা করছিলাম এই তো, তা আপনি যখন বলছেন, আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছাপতে পারি। সুবিমল বাবু যে ভাল লেখেন তা আপনার আসাতেই বুঝতে পারছি।

হিন্দুস্থানী চাকর বাসদেও চা দিয়ে গেল। শিশিরবাবু তাকে বললেন,—উপর থেকে ম্যানেজারবাবুকে একটু ডেকে দে। বলবি আমি ডাক্‌ছি, এখুনি যেন নীচে আসে।

প্রফেসর সুবিমলের দিকে চেয়ে ইসারায় জানিয়ে দিলেন, কাজ হয়েছে।

শিশিরবাবু সুবিমলকে জিজ্ঞাসা করলেন,—কোন্ বইটি আপনি প্রথমে প্রকাশ করতে চান?

সুবিমল প্রকাশকের হাতে একখানা পাণ্ডুলিপি তুলে দিল।

প্রকাশক বলে চললেন,—বেশ এখানাই প্রথম প্রকাশ করতে চান?

তারপর মিঃ সেনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপাততঃ তিনশ টাকায় ওঁর আপত্তি হবে না তো?

—না। প্রফেসর জবাব দিলেন।

ম্যানেজার নীচে নেমে এলে শিশিরবাবু তিনশ টাকার একটা চেক্ সুবিমলের নামে কেটে দিতে বললেন। সুবিমলকে জানালেন, আপনার বাকী বইগুলো যদি দয়া করে পড়তে দিয়ে যান বড় ভাল হয়!

সুবিমল নির্ব্বিবাদে প্রফেসরের হাত থেকে আর চারখানি পাণ্ডুলিপি নিয়ে শিশিরবাবুর হাতে তুলে দিল।

ম্যানেজার সুবিমলকে চেক্‌টা লিখে দিয়ে একটা রিসিট-এ আরও চারখানা বইয়ের প্রাপ্তি স্বীকার করে তাও সুবিমলের হাতে তুলে দিলেন।

প্রফেসর মিঃ সেন আর সুবিমল রায় শিশির বাবুকে নমস্কার জানিয়ে পথে নেমে এলো।

পথে নেমে প্রফেসর জানালেন, খুব ভাগ্যবান্ আপনি। আজই যে এতবড় একটা কাজ হয়ে যাবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। প্রথমে শিশিরবাবুর মনোভাবটা দেখলেন, ওর একেবারে বই নেওয়ার ইচ্ছে ছিলনা, যখন একখানা নিল, ওগুলোও নেবে। আপনি ভাবছেন বাকীগুলো পড়বার জন্যে রেখে দিল, মোটেই না। এ বইটা শীঘ্রই প্রকাশ করে দিয়ে দেখবে বাজারে আপনার চাহিদা কেমন। যদি দেখে প্রচুর সাড়া জাগিয়েছে, মার্কেট আপনার হয়ে গেছে, তখন বাকীগুলোর স্বত্বও ভদ্রলোক কিনে নেবে। আমাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না, ও-ই আসবে আমার আপনার কাছে। আর যদি দেখে পাঠক আপনার বই একেবারেই নেয়নি, তখন বাকী চারখানা আপনাকে ফেরৎ দিয়ে শিশিরবাবু গম্ভীর হয়ে বলবে,— পড়ে দেখলাম, বিশেষ সুবিধের বলে মনে হ'ল না : লিখে যান একদিন উন্নতি হবেই, জানেন তো "লিখতে লিখতে সরে ·····।"

কৃতজ্ঞতায় সুবিমলের ভাষা মূক হয়ে গেছে। একজন অজানা অচেনাকে এত দয়া, এত করুণা। ক'দিনেরই বা আলাপ মিঃ সেনের সঙ্গে, হোটেলের একজন সাধারণ বোর্ডার সুবিমল। নিজেকে তার কত ছোট মনে হয়, পৃথিবীতে আজও মিঃ সেনের মত মানুষের যে দেখা পাওয়া যায়, তা সুবিমলের কল্পনার বাইরে।

কয়েকদিনের মধ্যেই নন্দগোপালের প্রথম উপন্যাস সুবিমল রায়ের নামে প্রকাশ পেল! নামকরা প্রকাশকের নতুন ধরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় প্রশংশিত বিজ্ঞাপন সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে খুব বেশী দেরী হল না।

ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যে সুবিমলের এই নতুন অবদান সাড়া জাগিয়ে তুলল। প্রকাশকের ঠিকানায় সুবিমলকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি আসতে শুরু করলো একে একে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত পত্রিকায় প্রশংসা-মুখর সমালোচনা প্রকাশিত হল। সুবিমল বাংলার সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

সুবিমল নিজেকে ধন্য মনে করে। মনে মনে প্রফেসরকে অভিনন্দন জানায়, আর ভাবে নন্দগোপালের কথা। যে তাকে আপন সন্তানের মত বড় করে তুললো, নিজের সব কিছু দিয়ে সুবিমলকে গড়ে তুলল। সুবিমল নিজেকে কত ছোট মনে করে। আবার ভাবে নন্দগোপাল তার কেউ নয়, পিতার মত মানুষ করলেই পিতা হওয়া যায় না। আশ্রয় যদি না পেত সে নন্দগোপালের আশ্রয়ে, ঠিক কেউ না কেউ তাকে বড় করে তুলতো। পৃথিবীর আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত হতে সে পারতো যে কোনও মানুষের আশ্রয়ে থেকে। সুবিমল নন্দগোপালের চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে। সাহিত্যিক সুবিমল রায় আগামী দিনের সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে।

প্রথম উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেল। একে একে দ্বিতীয়, তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল, আর ধীরে ধীরে বাকী চারটা উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে সুবিমলকে সাহিত্যের আসনে সুনিশ্চিৎ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলে বাংলার পাঠক মহল।

বিস্ময় বিহ্বল হয়ে ভাবে সে, পিতৃ-মাতৃহীন এই সুবিমল হয়তো অমৃতসরে পথে পথে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো, নয়তো কোন গুণ্ডার দলে আশ্রয় নিয়ে চুরি রাহাজানি করে বেড়াত, নয়তো বেশ্যাদের দালালি করে জীবনটা কাটিয়ে দিত। কিন্তু তা না হয়ে এত সাহিত্যিকের মাঝে সেও একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে। সাধারণ মানুষ হতবাক্ হয়ে চেয়ে থাকবে তার দিকে। যেখানেই যাবে, পাবে প্রচুর সম্মান, পাবে গুণমুগ্ধদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। মানুষের জীবন যে কখন কোন্ স্রোতে বয়ে যায় কে জানে। কয়েক বছর আগেও সুবিমল এ জীবনের কথা কল্পনাও করতে পারতো না, আর আজ ব্লাক্মার্কেটিয়ারদের মত হঠাৎ অনেক কিছু করে ফেলেছে সে। নন্দগোপাল চিঠি লিখেছে অনেক দিন কোনও খবর না পেয়ে, জবাবটা আজই দেওয়া উচিত, আর···।

সুবিমল চিঠি লিখলে,—

পূজনীয় জ্যাঠাবাবু,—

প্রথমেই আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন; শরীর আপনার ভাল যাচ্ছে না শুনে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

বেশ কিছু দেরী হয়ে গেল, কারণ অনেক প্রকাশকের দুয়ারে ঘুরে ঘুরে আমি ক্লান্ত, এখনও কিছু করে উঠতে পারিনি। আপনার জীবনের শেষ ইচ্ছে যদি আমি পূর্ণ করতে না পারি, তবে আর অমৃতসরে ফিরে যাব না। আপনার ঋণ তো শোধ হবে না, এটুকুও যদি না পারি আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? আপনার লেখা পাঁচখানা উপন্যাস এক া নামকরা প্রকাশক কয়েকমাস ধরে পড়ে আজই ফেরৎ দিল, আপনার বাকী বইগুলো একবার দেখতে চায়। এক প্রফেসর বন্ধু খুব আশা দিচ্ছেন। বাকী লেখাগুলোও তিনি একবার পড়তে চান। আপনি ভাবছেন কিছু হবে না, পাঠিয়ে লাভ কি? কিন্তু আমি ভাবছি আশা ছেড়ে দেওয়ার মত এখনও কিছু ঘটেনি। দয়াকরে বাকীগুলো পাঠিয়ে দিন। মাস দুয়েকের মধ্যে অমৃতসরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে যদি কৃতকার্য হই!

আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি—

চিঠিলেখা শেষ করে, আর একবার ভাল করে চিঠিটা পড়ে নিয়ে ডাকবাক্সে নিজে ফেলে দিয়ে এলো সুবিমল।

সুবিমল এখন বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্তএই ভেবে যে, বৃদ্ধ নিশ্চয় বাকী বইকটা এ চিঠি পেয়েই পাঠিয়ে দেবে। এই বিশ্বাসের সদ্ব্যবহারটা যত তাড়াতাড়ি করে নেওয়া যায় ততই ভাল, অসময় আসতে কতক্ষণ। সময় ভাল যখন চলছে, তখন তাকে ভালকরে গ্রহণ করা যাক!

সরল নন্দগোপাল পুত্রস্নেহের অন্ধবিশ্বাসে বাকী ন'খানা উপন্যাস সুবিমলকে পাঠিয়ে দিল নির্ভাবনায়।

বাকী ন'খানাও আবার ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলার সাহিত্যাকাশে সুবিমল এখন একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাকে চেনে না, জানে না, তার লেখা পড়েনি এমন খুব কমলোকই মেলে বাংলার শহরে ও গ্রামে। সাহিত্যে সে নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছে। নতুন অবদানে সে বাংলার পাঠক-গোষ্ঠীর মন জয় করে নিয়েছে।

নন্দগোপালও সাহিত্যিক সুবিমল রায়ের নাম শুনে মাঝে মাঝে বিচলিত হয়।

সাহিত্যিক সুবিমল রায় উত্তর কলিকাতার হোটেলকে ভুলতে বসেছে। প্রফেসরের কথা এখন তার মাঝেমাঝে মনে হয় এই যা। নন্দগোপালকে শ্রদ্ধা করে সে, এই টুকুই।

সে এখন শহরের নির্জন পরিবেশে, একটা ফ্লাট ভাড়া নিয়ে পরম স্বচ্ছন্দে দিনগুলো কাটিয়ে যাচ্ছে। এই নির্জনতায় শহরের কোলাহল নেই; গাড়ীর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শোনা যায় না। কর্ম-চঞ্চল মানুষ সকাল সন্ধ্যে বাড়ীর সামনে ছুটে চলে না।

সুবিমলের ঠিকানা কেউ জানে না, প্রকাশককে বলা আছে, সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া যেন কেউ তার সন্ধান না পায়।

প্রকাশককে সে আরও জানিয়ে দিয়েছে, নির্জন পরিবেশে সে থাকতে ভালবাসে, সেখানে নিরিবিলিতে সাধনা তার ভাল চলে। একা একা বিদ্যাদেবীর আরাধনা ভাল হয়। কল্পনার রঙ্গিন স্বর্গরাজ্য তার একমাত্র কামনা। জনতার ভীড়ে সে সাহিত্যসাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। প্রকৃতির একটু স্পর্শ তার মনকে আবেগময় করে তোলে।

মিথ্যার জাল বিস্তার করে সুবিমল নিজেকে আড়াল করে রাখে। অজানিতের কাছে সে আরও মহৎ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। দৃষ্টির অন্তরালে পাঠকের মনের মণিকোঠায় সুবিমলের আসন আরও দৃঢ় হয়।

পাঁচ

বালিগঞ্জ প্লেসের এই নতুন ফ্লাটের ছোট্ট ড্রইংরুমে বসে চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজের হেডিংগুলোয় সুবিমল চোখ বুলিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য সুবিমলের এখন এসেছে। নন্দগোপালের পাঠান টাকার জন্যে আর তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। উপন্যাসের নতুন নতুন সংস্করণের সাথে সাথে বেশ কিছু করে অর্থ সুবিমলের একাউন্টে জমা পড়ছে। সাহিত্যিকের সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থের চাহিদা এখন মিটে গেছে। কল্পনার ফানুস এখন আরও স্ফীত হয়েছে। এই নির্জন বাড়ীতে বসে তাকে আর শুধু কাগজের হেডিং-এ মনোনিবেশ করতে হয় না। নতুন মোটরখানায় প্রায়ই ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গার মোহনার পাশ থেকে ঘুরে আসে সে।

সেদিনের কাগজে বিশেষ কিছু পড়ার মত ছিলনা, তবুও ওটা না দেখলে ভদ্র সমাজে কথা বলা চলে না বলেই সুবিমল সমস্ত খবর-গুলোয় একবার করে চোখ বুলিয়ে যায়।

চায়ের পেয়ালাটা সুবিমল শেষ করে টিপয়ে নামিয়ে রেখে ভাবলে, আজকের দিনটা কি করে কাটান যায়,—এমন সময় এই পল্লীর মিলা সরকার আর সুজন সেন নমস্কার করে ঘরে প্রবেশ করলো।

আধুনিক রুচিসম্পন্না মিলাকে শুধু সুন্দরী বলা চলে না, শিক্ষিতাও বলা যেতে পারে। আকাশি রংএর শাড়ীটা তার দেহ-লতাকে ঘিরে ব্লাউজের সঙ্গে সুন্দর ম্যাচ্ করেছে। উঁচু করে বাঁধা রিং খোপাটার নীচে মসৃণ বঙ্কিম গ্রীবা দর্শকের মনে মাদকতা আনে।

সুবিমল প্রতি নমস্কার করে দু'জনকে বসতে অনুরোধ করলো।

সুজন নবীন যুবা, সুঠাম স্বাস্থ্য আর তার সুন্দর বাচন ভঙ্গী প্রশংসা পাওয়ার মত। মিলাকে তার ভাল লাগে, মনের মণিকোঠায় তার একটা আসন পাতা আছে।

মিলার চলা, কথা বলা, তার সস্মিত দৃষ্টি, সংযত আবরণ সুজনের ভাল লাগে। মিলার স্পন্দিত, কম্পিত বক্ষ তাকে স্পর্শকাতর করে তোলে। মিলার স্বপ্নের বসন্ত-ভুবনে সুজন জেগে থাকে। স্বপ্নের দোদুল দোলায় মনোরম মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে সুজন মিলার কাজে সহযোগিতা করে। মিলাকে সে কিছুই প্রকাশ করে না; অন্তরে সমস্ত আশা গোপন করে সুজন পথ চলে। মিলা ছাড়া অন্য কোনও কথা কোনও ছন্দ সুজনের মনে রেখাপাত করে না।

সুজন ভালবাসে মিলাকে।

মিলা সে পল্লীতে একটা শিল্প-সংগঠনী শুরু করতে চায়। অসহায় মেয়েদের জীবিকার একটা সংস্থান এতে যে হতে পারে এ বিশ্বাস তার আছে। তাই তো সুজনকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটা সেলাই মেসিন আর একজন শিক্ষিকা সে জোগাড় করে ফেলেছে। মিলা যেখানে থাকে, তারই পাশের লাইব্রেরীতে একটা ঘরও সে জোগাড় করেছে। অনেকগুলো বিধবা মেয়ে মিলার শিল্প-সংগঠননীতে নাম লিখিয়েছে। পাড়ার সম্ভ্রান্ত প্রায় সকলকেই মিলা নিমন্ত্রণ করেছে—এই সংগঠনীর উদ্বোধন তিথিতে। কয়েকজনের আর্থিক সহযোগিতা সে এরই মধ্যে পেয়ে গেছে। মিলার প্রচেষ্টা যে সার্থক হবে একথা যে কেউ বলে দিতে পারে। সুজনেরও দান এতে যথেষ্ট রয়েছে, সুজন না থাকলে মিলার পক্ষে এত করা সম্ভব হ'তো না। সুজনই লাইব্রেরীর একটা ঘর জোগাড করে দিয়েছে। আর্থিক সাহায্যও তারই প্রচেষ্টায় পাওয়া গেছে। তবু মিলাই যেন এর প্রাণ, সুজন আছে শুধু মিলার কাজে সহযোগী হিসাবে। মিলার প্রচেষ্টা পূর্ণতালাভ করুক এই চায় সুজন। মিলার কৃতকার্য্যে সুজনের প্রাণটা ভরে যায়, অবচেতন মনে অপূর্ব আনন্দ অনুভব করে সে, যা প্রকাশ করা যায় না।

শিল্প-সংগঠনীর দরজা উদ্বোধন করতে মিলা সুবিমলকে অনুরোধ করলো, বললে,—আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এর প্রয়োজনীয়তা

কতখানি। আমাদের দেশের বিধবা মেয়েরা কত অসহায়। একটু আত্ম-নির্ভরতা যদি এরা এর মাধ্যমে লাভ করে; আমাদের সমাজের কত উপকার এতে হতে পারে বলুন তো! আপনি তো লেখক, আপনাকে বুঝিয়ে বলার কোনও দরকার যে নেই তা আমরা জানি; আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করে দয়া করে একটু আসুন।

এর মত ভাল কাজ আর কি থাকতে পারে মিলাদেবী! আমাদের দেশের অসহায় মেয়েদের কথা একবার চিন্তা করলে বুক ফেটে যায়। মনে হয় আমরা যে প্রগতির কথা বলি, বলি দেশ এগিয়ে যাচ্ছে; সমাজের কুৎসিত ব্যাধিগুলো একে একে ভাল হতে চলেছে, তা যে কত মিথ্যে এই অসহায়দের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। আমরা কি আমাদের মেয়েদের আজও শিক্ষা দিতে পেরেছি, আজও কি তাদের মুক্তির আনন্দ এতটুকু দিতে সক্ষম হয়েছি, না! সবই বাইরের প্রলেপ, যেমন ছিল, ভেতরটা ঠিক তেমনি আছে, এতটুকু পরিবর্তন আসেনি। বাহ্যিক রূপ দেখে অন্তরের রূপকে আমরা চিন্তে পারি না।

—আসছেন তো?

—জানেন তো আমি কোথাও যাই না, কোনও সভা সমিতিতে যাওয়া আমার ভাল লাগে না, তাতে সাহিত্য-সাধনার ব্যাঘাত হয়।

তবু আসুন, একটা সন্ধ্যে আমাদের মধ্যে আপনাকে চাই!

—কোথাও যাই না, তবু আপনার আহ্বানে নিশ্চয় যাব, আর বিশেষতঃ যখন এই পল্লীতেই এমন ভাল কাজ হতে চলেছে। আমার সমর্থন ও সহযোগিতা আপনারা পাবেন।

মিলা সুবিমলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললে,—আমি জানতাম আপনি আসবেন। যাঁর লেখায় এত দরদ, তাঁর হৃদয় যে সত্যিই মহৎ এ কথা জোর করে বলা যায়। আমি সুজনকে আগেই বলেছি—সুবিমলবাবু নিশ্চয় আসবেন, তাঁর মনটা যে কত বড়, তাঁর লেখা দেখেই বোঝা যায়!

—ও সব বলে আর লজ্জা দেবেন না !

সত্যি কথাই তো সুবিমলবাবু; মিথ্যা তোষামোদ তো করছি না।

—তা হোক্, আত্মপ্রশংসা সামনে বসে শুনতে লজ্জা করে ।

লজ্জা সুবিমলের মোটেই নেই। আত্মপ্রংশসা শুনে সে বরং মনে মনে পুলকিত হচ্ছিল। ভাবছিল,—মিলা আরও বলুক। মিলার মুখের কথাগুলো সুবিমলের মনের তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে নতুন রাগের ঝংকার তুলছিল। হৃদয়ের আনাচে কানাচে পূর্ণতার আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠছিল ।

মিলা বললে,—বেশ, আর কিছু বল্‌ব না ।

—রাগ করলেন মিলা দেবী ?

—না।

—ধন্যবাদ।

—কাল আসছেন তো ?

—নিশ্চয় !

—ভুল হলে, টেনে নিয়ে যাব।

—স্বচ্ছন্দে। ভুল হবে না। আপনার প্রচেষ্টা সার্থক হোক মিলাদেবী।

—ধন্যবাদ ! আজ তবে আসি। নমস্কার।

—নমস্কার ।

সুজন আর মিলা ধীরে ধীরে চলে গেল; সুবিমলের মনটায় কেমন যেন রং ধরিয়ে দিল। সুবিমলের যৌবনের ভুমিকায় প্রথম ভালবাসার আবির্ভাব হল তার মনোলোকে। এই ভাললাগার রোমান্স-দীপ্ত ভাবভাবনাগুলো রূপকথার আঙ্গিকে বড় নিপুণভাবে প্রকাশিত হল, তার মানষ-দেউলে।

ছয়

শিল্পী-সংগঠনীর উদ্বোধন হয়ে গেল স্বাড়ম্বরে। সুবিমল কথা বলায় ওস্তাদ। বেশ একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়েছিল সে। সমাজের বর্তমান অবস্থা, নারী স্বাধীনতার প্রয়োজন কি? কেন আমাদের পুরুষ-শাসিত সমাজে মেয়েদের ঘরে রাখা হল; শিল্প-সংগঠনী মেয়েদের আত্মনির্ভর করে কেন? ইত্যাদি।

সবাই বাহবা দিল।

মিলা নির্বাক বিস্ময়ে সুবিমলের দেওয়া বক্তৃতা শুনছিল, আর মনে মনে ভাবছিল,—মানুষ বড় হলে মনটাও কত বড় হয়। সংসারে তো কত ধুলো আছে, আছে মালিন্য আর মলিনতা, অশিক্ষিত শতাব্দীর অন্তহীন অত্যাচার আজও চলে আসছে; তারই মাঝখানে সুবিমল একটু সুরের আনন্দ দিয়ে, ভাবের চেতনা জাগিয়ে মানুষের আত্মোন্মেষ চান। মানুষের মাঝেই তো অতি মানুষ আছে, লেখক সুবিমলবাবুকে দেখলেই সে সত্যোপলব্ধি হয়।

সুবিমলের কথার সকলেই প্রশংসা করছে, মিলা শুধু নির্বাক, সে উপলব্ধি করছে বক্তৃতার কথাগুলো, মনে মনে যাচাই করছে সুবিমলকে, সুবিমলের আরও কাছে নিজেকে রাখতে চায় মিলা।

চলে যাওয়ার পথে সুবিমল মিলাকে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ করলো। মিলার আনন্দ আর ধরে না; এতদিনে মানুষের সংস্পর্শ সে পাবে। যার অনেক আছে, অনেক দিয়েও যার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে থাকে, ঠিক লক্ষ্মীর মত; তারই নিমন্ত্রণে মিলা নিজেকে ধন্য মনে করলো। স্বাগ্রহে রাজী হয়ে গেল সে।

মিলা এলো সুবিমলের ড্রইংরুমে।

সুবিমল যেন তারই প্রতীক্ষায় বসেছিল, বল্লও তাই,—মিলাদেবী, আপনার প্রতীক্ষায় বসে ছিলুম।

মিলা আশাতীত পাওয়ায় সচকিত হয়ে উঠলো।

চায়ের পালা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল।

সুবিমল ড্রয়ার থেকে চেক্ বইটি বার করে একশ টাকার একটা চেক্ লিখে মিলার হাতে দিয়ে বললো,—আবার বল্‌ছি, আপনার সংগঠনীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি মিলাদেবী।

মিলা অভিভূত হল সুবিমলের ব্যবহারে।

কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো সে, সুবিমলকে আরও ভালোলাগলো তার, তার সঙ্গ আরও একটু পেতে চাইল অন্তর দিয়ে। যেদিন সুবিমলের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ হয়, সেদিন রাত্রে আকাশের দিকে চেয়ে তার মনে হয়েছিল, কি যেন লেখা রয়েছে ওই অনন্ত আকাশের গায়ে, তারাগুলো যেন এক একটা হরফ। কি যেন বলতে চায়, ঠিক সুবিমলের চোখের তারার মত। ক্ষণিকের এই আলাপে সুবিমলের মনের গভীরতম দেশে যে ভাবনা-বেদনা—আবেগ—অভিলাষ জমা হয়ে আছে, ষ্টেথিস্কোপের মুখে বুকের স্পন্দনের মত মিলার চোখে তা ধরা পড়ে যায়।

মিলা বল্‌লে—ভুলে যাবেন না আমাদের।

—ভুলতে আমি চাই না, আপনার সংগঠনীকেও না, আপনাকে তো নয়-ই।

—আবার আসব, মাঝে মাঝে এমনি করেই সাহায্য পাব আশা করি।

—নিশ্চয় আসবেন, মাঝে মাঝে কেন? আমি একা, কেউ নেই যে দুটো কথা বলি, নিজেকে বড় একা একা মনে হয়।

—বেশ তাই হবে, আজ আসি।

—না? মনটা আজ আমার ঠিক নেই, কেমন যেন একটা অস্ফুট উপলব্ধি মনের মাঝে দানা বাঁধছে। প্রকাশ করতে পারছিনা, আবার মনের মাঝে পুষে রাখতেও কষ্ট হচ্ছে।

—কেন ?

—জানিনা। চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি।

সুবিমলের নতুন মোটরখানা ডায়মণ্ডহারবারের দিকে ছুটে চলেছে। স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে আছে সুবিমল। মিলার চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। মাঝে মাঝে মুখে চোখে উড়ে এসে পড়ছে। মিলাকে বেশ খানিকটা কাছে টেনে নিলো সুবিমল।

মিলার কুমারী জীবনে প্রথম রোমান্স উপলব্ধি হল সুবিমলের আলতো ছোঁয়ায়। মিলা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছে ধীরে ধীরে। কি একটা আকর্ষণ আছে সুবিমলের চোখে।

সুবিমল বলে,—আজ কি মনে হচ্ছে জানেন, মনে হচ্ছে আপনার মধ্যে প্রথম প্রেমের লীলাবিলাসের প্রথম সন্ধান পেলাম, প্রকৃতির সঙ্গে আপনি মিশে গেছেন। আমার মনে এতদিন যে ধ্যান-ধারণা ছিল, তার বাহ্যিকরূপ আপনার দেহটা, আর আমার নতুন উপন্যাসের আগামী নায়িকা আপনার মন। আজ আমি মিশে গেছি, এক হয়ে গেছি আপনার দেহ মনে। আমার নিজের আর কোনও অভিব্যক্তি নেই ; আমার প্রকাশ দু'জনের একাত্মের প্রকাশ। নিজের স্বত্বা হঠাৎ তলিয়ে গেছে অতল গভীরে। প্রেম মুক্তি আনে, কিন্তু সামাজিক মুক্তি আসে না আমাদের, তাইতো অবাধ আনন্দ প্রকাশ পায় না। চলে হাহাকার। আমার মনেও সেই হাহাকার একটু একটু করে আজ থেকে জমা হয়ে উঠছে।

সূর্য তখনও পশ্চিম আকাশের কোলে ঢলে পড়েনি, রক্তমাখা আকাশ তখনও নদীর বেলাভূমিতে আবির ছড়ায়নি। সুবিমলের মোটরখানা নদীর পাড় ঘেঁসে নির্জন বটগাছটার কাছে এসে থেমে গেল।

মিলা আর সুবিমল নদীর বাঁধের একটা কোণে চুপটি করে বসলো। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললো না। জলের কল কল, খল খল শব্দ বাতাসের সঙ্গে মিশে ছুটে চলেছে। পালতোলা

একটা নৌকা মাঝ গঙ্গায় ভাসছে, পায়ের নীচে জলের ছোঁয়া লাগছে মাঝে মাঝে।

মিলা সুবিমলের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছে, মনে মনে বলছে,—সুবিমল, তুমি সত্যিই ভগবানের আশীর্বাদের মত আমার জীবনে নেমে এসেছ। আবার বলছি ধন্য আমি, তোমার ওই চওড়া বুকটায় আমায় একটু ঠাঁই দাও। মাথার চুলগুলো তোমার ওই আঙুলের মধ্যে মুঠি করে ধর, আমায় আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে আদর কর, চুম্বন কর শত শত, যত তোমার খুশী, তুমি যা চাও, তাই নাও, আমার অদেয় কিছুই নেই। মনটাই-তো আগে সঁপে দিয়েছি। মনের কাছে দেহটা তো কিছুই নয়। নাও, দু-হাত উজাড় করে দিলুম, তুলে নাও।

সুবিমল মিলাকে একেবারে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বললো,—মিলা, আজ থেকে আর আপনি নয়, তুমি। আপনি বড় দূরে সরিয়ে দেয়।

—বেশ তো, তাই বল।

—আপত্তি করবে না তো ?

—না গো না, আপত্তি কি করেছি, তোমায় অদেয় তো কিছুই নেই, সবই তোমায় তুলে দিয়ে ধন্য হয়েছি, এবার গ্রহণ কর।

—বেশ তাই হোক।

আর কথা নয়, দু'জনায় নিশ্চুপ নির্বাক, মিলার ঘন ঘন নিশ্বাস শোনা যায়। সমস্ত দেহটা তার কেমন যেন অবস হয়ে পড়ে, মাথাটা নুয়ে পড়ে সুবিমলের কোলের উপর। হাতের মুঠোয় সুবিমলের বলিষ্ঠ আঙুলগুলো এতক্ষণ চেপে ছিল মিলা, এবার সেগুলো ছাড়া পেয়ে গেল।

সুবিমল ভাবে, মন্দ কি, একা ভাল লাগে না ; মিলার মত মেয়ে, যে ক'টাদিন পাওয়া যায়, দিনগুলো শরতের আলোর মত সুন্দর করে কাটান যাবে।

সুবিমল চাইলেও মিলা তো চিরদিন থাকবে না। একদিন আপনিই সে যাবে, যখন সুবিমল শত চেষ্টায়ও আর মিলাকে ধরে রাখতে পারবে না। ধরে রেখে লাভই বা কি? বাসি হলে গোলাপের পাপড়িগুলো যেমন ঝরে পড়ে, মিলাও তো তেমনি একদিন ঝরে যাবে। এই উন্নত উন্মাদ বক্ষ স্ফীত হবে। চোখের নীচেটা ঢিলে হয়ে আসবে। একটা একটা করে এই চূর্ণ অলকগুচ্ছয় রং ধরবে।

হায়রে! হাসি পেল তার!

নিশ্চল মিলা কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে।

কোথা থেকে যেন কি হয়ে গেল, ক্ষণিকের মধ্যে মিলার জীবনে কত পরিবর্তন। কে জানতো সুবিমলকে মিলা এত কাছে পাবে। এ তার আশাতীত। স্বপ্নেরও অতীত। সুবিমলকে মিলার আজ আর খুব অসাধারণ মনে হল না. সে খুব সাধারণ; মিলা যেন সুবিমলের মাঝে আরও কিছু আশা করেছিল, যা সাধারণের কাছে নেই।

তবু সুবিমলকে তার ভাল লাগল, মনের অন্তরতম দেশে সুবিমলের আসন পাতা হল ধীরে ধীরে।

সন্ধ্যে হয়ে এলো, মোটর সেই পরিচিত পথেই ছুটে চলেছে। এখনও স্টিয়ারিং ধরে সুবিমল, মিলা তার দেহলতাকে সুবিমলের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে।

এমনি করে প্রায় প্রতিদিনই চলে মিলার অভিসার। সুজনের কথা সে প্রায় ভুলেই গেছে। সুবিমল তার প্রায় প্রত্যেকটি সন্ধ্যা মিলার জন্যে ব্যয় করে, কোনও দিন কাটে ম্যাডাস্কোয়ারের নির্জন পরিবেশে, বিলিতি ফুল গাছের কোল ঘেঁসে সবুজ ঘাসের কারপেটে বসে, কোনও দিন বা কাটে সুবিমলের বাড়ীর ছাদে তারায় ভরা আকাশের তলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরে। মিলা গান গায় সুবিমল অবাক হয়ে শোনে।

মিলাকে নতুন নতুন রূপে, নিত্য নতুন সাজে সুবিমল দেখতে পায়, কোনও দিন চপলতার চঞ্চল নৃত্য-ভঙ্গিমা তার ভাল লাগে, আবার কোনও দিন মিলার অভিমানী রূপে সে নিজেকে বিভোর করে তোলে।

ক্ষণিকের জন্যে সুবিমল পৃথিবীর সমস্ত কিছু ভুলে যায়, ভুলে যায় নন্দগোপালকে, ভুলে যায় তার সাহিত্যিক জীবনের প্রতিষ্ঠাকে। মিলাকে পাওয়ার আনন্দে, তাকে গ্রহণ করার রোমান্টিক প্রচেষ্টায় শত শত ভাষার হিল্লোলে সে মিলাকে ভুলিয়ে রাখে। তার তপ্ত-প্রেম-তৃষা সে মিলার হাতে তুলে দিতে চায়।

মিলার অনুরাগ, মান, অভিমান, সুবিমলকে মিলার আরও কাছে টেনে নিয়ে যায়।

সুবিমলকে মিলা প্রীতিদানে, গীতিদানে, দৃষ্টিদানে আচ্ছন্ন করে রাখে।

সাত

সুজন আর তেমন মিলার দেখা পায় না, শিল্প-সংগঠনীর কাজ সবই প্রায় সুজনের উপর চেপে বসেছে। সুজন একাজে এখন আর তেমন প্রেরণা পায় না, তবুও কর্তব্য সুজনকে এখনও সংগঠনীর কাজে আটকে রেখেছে। মনের বিরুদ্ধে এই প্রথম সুজন কাজ করে চলেছে। সুজন জানে মিলার এখন সময় সত্যিই কম। সুবিমলকে সঙ্গ দেওয়া তার একটা বড় কর্তব্য বলে মিলা এখন মনে করে। সুজন যে কোনও দিন তার জীবনে এসেছিল, কিংবা আসতে পারতো এ কল্পনাও মিলা এখন করে না, কোনও দিন করতো কিনা তাও বলা যায় না। সুজন ভাবে, সে তো মিলাকে কোনওদিন তার মনের অন্তরতমদেশে যে কামনা জমা করা আছে তা প্রকাশ করেনি; তবু সুজন ভাবে মুখফুটে প্রকাশ না করলে যদি প্রকাশ না হয়, তবে

তেমন প্রকাশের কোনও প্রয়োজন আছে কি? সুবিমল মিলাকে কতখানি দিতে পেরেছে সুজন জানে না, তবু সুজন এইটুকু জানে সে মিলাকে সবটুকু উজাড় করে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পথে নেমে এসেছে। এখন আর তার কিছু নেই, এতটুকু সঞ্চিত কিছু থাকলেও সে আগামী জীবনকে টেনে নিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব।

শিল্প-সংগঠনীর বেশ কিছু কাজ একেবারে জমা হয়ে আছে, যা মিলার নিজস্ব ব্যাপার, মিলা না থাকলে সে কাজগুলো সুজনের করার উপায় নেই।

সে'দিন সুজন সারাটা দিন মিলার জন্যে অপেক্ষা করে রইল। মনে মনে আকুল হয়ে মিলার দর্শন কামনা করলো। মিলা এলো না। সন্ধ্যে নেমে এলো, একে একে রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠলো। আকাশে একটা একটা করে তারা মিট্‌ মিটে আলো জ্বেলে দিলো। সংগঠনীর দরজা খুলে তবুও সুজন বসে আছে। মনের আনাচে কানাচে স্মৃতির মেঘ জমা হয়ে উঠছে। মনে পড়ছে প্রথম দিনের কথা, যেদিন মিলাকে সঙ্গে নিয়ে সুজন সংগঠনীকে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেছিল। যেদিন মিলার আমাদের দেশের মেয়ে-দের অসহায় অবস্থার কথা বলতে বলতে চোখের কোণে জল চিক্‌ চিক্‌ করে উঠেছিল। যেদিন মিলা বলেছিল, সংসার ধর্ম তার মত মেয়েদের জন্যে নয়, ওতো সাধারণের। মিলা সাধারণের বাইরে। জীবনটা এমনি করেই সমাজের ভালর কথা চিন্তা করে কাটিয়ে দেবে সে। একপাল ছেলে মেয়ে নিয়ে গিন্নী সেজে বসা তার পক্ষে অসম্ভব। সে অসাধারণ।

সেদিন থেকে সুজন তার মনের কথা মনের মাঝেই লুকিয়ে রেখে কাজ করে এসেছে। মিলাকে ভালবেসেছে, প্রকাশ করতে পারেনি।

আজ সুজনের মনটা মিলার জন্যে বারবার কেঁদে কেঁদে উঠছে,

কেন ? সুজন জানে না, হয়তো সারাটা দিন তার চিন্তায় কেটেছে, তাই। সুজন, মিলার বাড়ীর দরজায় এসে টোকা দিতেই মিলার মা জানালেন,—মিলা সুবিমলবাবুর বাড়ী গেছে, আসতে একটু রাত হবে।

সুজন যেন আরও আঘাত পেল, আঘাত পেয়েও সহ্য করতে পারার অভ্যাসটা তার এখন হয়ে গেছে। একটুতেই খুব বেশী মুস্‌ড়ে এখন আর পড়ে না সে। এই অবস্থাটা একটু একটু করে সহ্যের মধ্যে চলে এসেছে, বুকের ব্যথা বুকের মাঝেই গুম্‌রে মরে, সুজন প্রকাশ করতে পারে না। কেউ নেই যে তার কথা শোনে, সুজনের বুকটা একটু হালকা হয়; ভার খানিকটা কমে আসে! বুকটা আরও ভারী হয়ে এলো। অনেক হাহাকার জমা করা আছে, খুব খানিকটা কাঁদলে হয়তো একটু নিষ্কৃতি পায় সে, কিন্তু চোখে জল আসে না; না কেঁদে কেঁদে কান্না যেন সে ভুলে গেছে! হা-হুতাস সে কোনও দিনই করতে ভালবাসে না, তবুও আজকাল কথায় কথায় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তিল তিল করে বুকের রক্ত দিয়ে যে তিলোত্তমাকে সে গড়ে তুলেছে, সে এখন ভেঙ্গে গেছে, সুবিমল তাকে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়েছে।

মিলাকে তবুও তার আজ একান্তই প্রয়োজন, আজ যেন মিলা আরও হারিয়ে যাচ্ছে। আর সুজন যেন তলিয়ে যাচ্ছে গভীর জলে। অতল জলে মাটি ঠেকছে না, সামান্য কুটোও আজ হাতের কাছে সে খুঁজে পাচ্ছে না, যে একটু ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে। আজ যে সুজনের কেন এ কথা মনে হচ্ছে, সে নিজেও বুঝতে পারছে না। মিলাকে হারাতে পারবে না সে, সব কিছুর বিনিময়ে তাকে ফিরে পেতে চায় সুজন।

সে সুবিমলের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছে। মিলাকে আজ সুজন সবই বলবে, কিছুই গোপন করবে না সে। বলবে,—মিলা, ভুল

আমি করিনি, মিথ্যার আশ্রয়ও কোনও দিন নিইনি, শুধু তোমার কথা ভেবে এতদিন আমি তোমায় প্রকাশ করিনি,—আমি তোমায় ভালবাসি। আমার বুকের সমস্ত রক্তরস দিয়ে একটু একটু করে তোমায় মনের মন্দিরে পুজো করে এসেছি, ভুল বুঝ না ; গ্রহণ কর আমায়। তোমায় অদেয় আমার কিছুই নেই। আজ যদি আমি প্রত্যাখ্যাত হই, আমি কি নিয়ে বাঁচবো তুমি বলে দাও। আবার বলছি, আমায় গ্রহণ কর মিলা, যেমন করে তুমি সামাজিক ভা'লাকে একদিন মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলে, ঠিক তেমনি।

সুজন সুবিমলের ড্রইংরুমে এসে উপস্থিত হল।

ড্রইংরুমে কাউকে দেখছে না সুজন, শুধু চাকরটা এক কোণে বসে বসে ঢুলছে। সুজন প্রথমে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলো, হয়তো সুবিমল মিলাকে সঙ্গে নিয়ে আজও ডায়মণ্ডহারবার কিংবা ম্যাডাস্কোয়ার বেড়াতে গেছে। আবার পরক্ষণেই মনে পড়ল মোটরটাতো এখনও গ্যারেজে পড়ে রয়েছে। সুবিমল আজকাল মোটর ছাড়া কোথাও যায় না। তবে কি ছাদে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর জমেছে ; তাও তো নয়, কারণ গানের একটা কলিও তো সুজনের কানে এসে পৌছয়নি।

মিটমিটে নীল আলোটা বাইরের ঘরে জ্বলে রয়েছে। একটা মাদকতা আছে এই ছোট ঘরটায়। পাথরের ছোট একটা বাস্ এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, নারীদেহের নগ্ন সৌন্দর্য নিখুঁতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। লম্বা পিয়ানোটার উপর একটা পুরোন নটরাজের মূর্তি, আর এক কোণে ছোট একটা টিপয়, বড় টেবিলটার তিন ধারে একটা বড় আর ছোট ছোট দুটো কোচ। দেওয়ালে একটাও ছবি নেই, শুধু বড় একটা ক্যালেণ্ডার,—PaM American Airways এর,—বাইরের হাওয়া লেগে মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে।

সুজন চাকরটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, হ্যারে, সুবিমলবাবু আছেন ?

—আছেন বাবু।

—একবার ডেকে দেতো।

—দেখা হবে না।

—কেন?

—মিলাদেবী এসেছেন।

—মিলাদেবীকেও দরকার, যা ডেকে দে।

—হুকুম নেই বাবু, আপনি একটু বসুন, এ ঘরে এলে দেখা হবে।

—গিয়ে বল সুজনবাবু এসেছেন।

—দরজা বন্ধ।

সুজনের বুকটা দপ্ করে উঠলো, নীচের মাটি যেন সরে যাচ্ছে। মাথা ঠিক করে রাখতে পারছে না সে, পড়ে যাবে এখনই। তবু কোনওরকমে টেনে টেনে আবার জিজ্ঞাসা করলো,—দরজা বন্ধ?

—হাঁ।

সুজন ছুটে বেরিয়ে এলো। কেন এলো সে এখানে। মিলার সঙ্গে কি এমন প্রয়োজন ছিল তার। এ কি শুনলো সে! না, না! বিশ্বাস হয় না। মিলা, তুমি একি করলে, তুমি তো এতো ছোট নও! তোমায় যে অনেক বড় বলে ভাবি, অনেক উঁচুতে তুমি ছিলে, এখুনি মনে মনে বলছিলাম, মনের মন্দিরে রেখে আমি তোমায় পুজো করি মিলা। হায়! মিলা, তুমি এতবড় ভুল করলে, এ যে একান্ত সাধারণের, তুমি যে বলেছিলে তুমি অসাধারণ, এই তার প্রমাণ! এতটুকুতেই তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিলে। আর আমি দিনের পর দিন তোমার পথ চেয়ে জীবনের এতগুলো বসন্ত হারিয়ে এলুম। আজও আমি তোমার, এটা তুমি বুঝলে না, ভাবলে না একবারও!

এমনি হয়। সত্যিকার ভালবাসার দাম হয়তো আজ আর কেউ দিতে জানে না, আসলকে চিনতে ভুল করে অধিকাংশই। মেকি,

আর নকলের কারবার এখন চারদিকে। খাঁটি বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে: সততা এখন এমনিভাবেই পদদলিত হয়। কালোবাজার এখন শুধু বাজারেই কেন্দ্রীভূত নয়, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

সুজনের কাছে আধুনিক জগৎটা এমনি এক ভেজাল ব্যাপারিব আড্ডা বলে মনে হল। সে সত্যের উপর নিষ্ঠা রেখে যে শিল্প-সংগঠনীর প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাকেও এখন সুজন অসত্যের আড্ডাখানা বলে ভুল ভাবল: বিশ্বাসের সব কিছুই যেন ক্ষণিকের মধ্যে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। মেয়েদের প্রতি তার একটা আলাদা শ্রদ্ধা ছিল, এখন এক নিমেষে তা কোথায় উধাও হয়ে গেল।

মিলাকে মন থেকে একেবারে সরিয়ে দিতে চাইল সে। কিন্তু মিলাই তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তায় বাসা বেঁধে রইল।

কলকাতার এই জীবনটা যেন বিষিয়ে উঠেছে। সুজনের আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে রইল না। মনে হল ছুটে চলে যায় কোথাও যেখানে মানুষ বাস করে না, সেখানে। তার ভারাক্রান্ত মন আর চলতে পারে না; কোনক্রমে টেনে টেনে চলা, আর-না-চলা একই। অবিশ্বাস, বিসাদ, আর সন্দেহ সুজনের মনপ্রাণ ঘিরে ধরেছে; মিলা ছিল যেন এই পৃথিবীর ভালর একমাত্র প্রতীক। তাকে নিজের মনের মত না দেখতে পেয়ে সে সমস্ত পৃথিবীটাকে ধিক্কার দিতে দিতে চলে গেল কলকাতার বাইরে, নির্জন একটা গ্রামে।

এই একটানা জীবনটা বড় একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল, এবার একটু পরিবর্তন আসবে তার দেহ-মনে। পৃথিবীকে সে নতুন চোখে দেখবে, নতুন করে চিনবে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করবে, ভাল-মন্দয় মাখান এই মানুষগুলো তার মনের পর্দায় নতুন করে রূপ পরিগ্রহ করবে।

সুজন চলে গেল দূরে; আর তার সংগঠনী এখানে একলা পড়ে রইল।

আট

অমৃতসর আর ভাল লাগে না নন্দগোপালের কাছে। জীবনের এতগুলো দিন এখানে কেটে গেল, কোনওদিন অমৃতসর তার কাছে নীরস বলে মনে হয়নি; আজ সুবিমলের অভাবে এ শহরও তার কাছে প্রাণহীন হয়ে পড়েছে।

প্রতিদিন বাগানে ইজিচেয়ারে গা'টা এলিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ নন্দ-গোপাল মাসিক পত্রিকার গল্পে অথবা প্রবন্ধে মনটা সঁপে দিয়ে বৈকালিক আবহাওয়াকে প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করে। সন্ধ্যায় স্বর্ণ-মন্দির আজও তাকে আকর্ষণ করে, এখানে না এলে তার সমস্ত রাত্রিটা অনিদ্রায় কাটে।

নন্দগোপাল এখন আর লেখে না; লেখা আর তার আসে না। যেদিন সুবিমল চলে গেছে, উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিগুলো যেদিন সুবিমলের হাতে তুলে দিয়েছে সে, সেদিন থেকে লেখা তার বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু পড়া চলে তেমনই। বরং আজকাল নন্দগোপালের পড়ার সখটা খুব বেড়ে গেছে। বিদেশী সাহিত্য আর দেশী মাসিক পত্রে এখন ঘরের টেবিলটা পূর্ণ হয়ে থাকে।

বাংলা মাসিকে মাঝে মাঝে সুবিমল রায়ের বইএর সুন্দর সমা-লোচনা বের হয়, নন্দগোপাল মন দিয়ে পড়ে, প্রত্যেকটি কথা চিন্তা করে উচ্চারণ করে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে উঠে; কে? কে এই সুবিমল রায়!

যাকে ছেলের মত একটু একটু করে বড় করে তুলেছে নন্দগোপাল, যাকে পথের আবর্জনা থেকে ঘরের পালঙ্কে শুইয়ে দিনের পর দিন, নিজে নিঃস্ব হয়ে যাকে সর্বস্ব দিয়েছে নন্দগোপাল, এ সুবিমল কি সেই সুবিমল? যাকে পাঞ্জাবী এক ভদ্রলোক নন্দগোপালের হাতে তুলে দিয়ে ওই স্বর্ণমন্দিরটার পাশে বলেছিল, এর বাবা ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে, এই কি সেই সুবিমল!

নন্দগোপাল চিন্তায় কুল পায় না। মনে মনে ভাবে পৃথিবীতে অন্য সুবিমলও তো আছে। যাকে নিজের হাতে বড় করেছে সে, যে জ্যাঠাবাবুর দুঃখে ময়লা পাণ্ডুলিপিগুলো কলকাতায় নিয়ে গিয়ে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে এ সুবিমল হতে পারে না।

নন্দগোপালের নিজের মনটাকে কত ছোট মনে হল। ভাবলো, আজ সে এত নীচুতে নেমে এলো কি করে, এত ছোট চিন্তা সে করলো কি ভাবে। সুবিমলের হৃদয়টা মহৎ। নন্দগোপালের ভবিষ্যৎ বংশধর নেই, সেই তো তার ভবিষ্যৎ। তার জীবনে যা অপূর্ণ হয়ে আছে, তা পূর্ণ হবে সুবিমলের জীবনে। সর্বস্ব তাকে দিয়ে যেতে চায় নন্দগোপাল। কিছুই সে নিজের জন্যে রাখবে না; সবকিছু জমা করা আছে সুবিমলের ভবিষ্যতের জন্যে।

মনটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। অনেকদিন সুবিমলের কোনও সংবাদ পায়নি নন্দগোপাল। একটা চিঠিও লেখা প্রয়োজন মনে করেনি সে। কেন? হয়তো আজও সুবিমল নন্দগোপালের পাণ্ডু-লিপির কোনও ব্যবস্থাই করে উঠতে পারেনি, হয়তো সেই প্রফেসর সুবিমলকে কোনও আলোর সন্ধান দিতে পারেনি, তাইতো অভিমান করে বেচারা বুড়ো জ্যাঠার কাছে ফিরে আসতে পারছে না। সে তো চিঠিতে লিখেছিল, আপনার জীবনের শেষ ইচ্ছে যদি আমি পূর্ণ করতে না পারি, তবে আর অমৃতসরে ফিরে যাব না। হায়রে! সে হয়তো আর আসবে না, আর জ্যাঠাবাবু বলে আদর করে কিছু চাইবে না, বাকী জীবনটা একা কাটাতে হবে।

কলকাতা অত বড় শহর। হঠাৎ সেখানে কোন কিছু করা কি ওই একরত্তি ছেলের পক্ষে সম্ভব! কত লেখকই তো প্রকাশকের অভাবে শেষ হয়ে যায়। কেউ জানতে পারে না, কুঁড়িতেই কত কবি, কত সাহিত্যিক এই পৃথিবীর মাটিতে ঝরে পড়ে। সুবিমল চেষ্টার ত্রুটি করছে না ঠিকই, কিন্তু

কি করবে সে। সাহিত্যিকের ভীড়তো সেখানে কম নেই ; আর লেখক আছে প্রচুর। না থাকলেও এই বুড়োর লেখা কে আর কষ্ট করে পড়ছে। কার দায় ঠেকেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওই পুরোন পাণ্ডু-লিপির পাঠোদ্ধার করতে। জীবনটা তার এমনই কেটে গেল, কেউ চিনলো না, জানলো না. চিনবার বা জানবার চেষ্টা করলো না। বাংলার বাইরে থেকে তার জীবনের অমূল্য সংপদের অপচয় হল। আজ যদি নন্দগোপাল কলকাতায় পড়ে থাকতো. তার লেখা প্রকাশের একটা পথ সে ঠিক বেছে নিতে পারতো। কিন্তু শিখা ! শিখাই তার জীবনের পথ ঘুরিয়ে দিল. তাকে এই মরুভূমির দেশে পাড়ী জমাতে বাধ্য করাল। কলকাতার মধুময় জীবন তাকে ভোগ করতে দিল না। দেউলিয়া হয়ে ফিরে যেতে হল ওই মহানগরী থেকে অমৃতসরে। সারাটা জীবন একাই কেটে গেল। কিন্তু এই জীবনের সায়াহ্ণে এসে সে শিখা মিত্রকে ভুলতে পারলো না। শিখাও আজ জীবনের শেষ সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। যৌবনের সে দীপ্তি আর নেই, কপালের চামড়াটা শত প্রলেপেও আর আজ ঢাকা থাকে না। লোমচর্ম, আর শুভ্র বরফস্তূপের মত সাদা চুলে আব তো বিজনের মাদকতা আসে না। শিখা এখন কোথায় ? অনেকদিন অনেক যুগের পর আবার শিখার ছবি ভেসে উঠছে নন্দগোপালের মনে। আবার এই বৃদ্ধ বয়সে তাকে দেখতে ইচ্ছে হয়। কাছে পেতে ইচ্ছে করে, বলতে চায় নন্দগোপাল,—শিখা, দেখ, আজও নন্দগোপাল কাউকে গ্রহণ করতে পারেনি, তোমার আসন আজও শূন্য হয়ে আছে। আজও তোমার কথা চিন্তা করে—এই বৃদ্ধ নামহীন সাহিত্যিক নন্দগোপাল রায়।

শিখার মনে আজও কি কোন দ্বন্দ্ব আছে ? আজও কি সে একবারের জন্যে চিন্তা করে, প্রথম যৌবনের কথা। নন্দগোপালকে একবারও কি কোনওক্ষণে মনে পড়ে তার ? জানতে ইচ্ছে করে।

সুবিমলের চিন্তা সরে গিয়ে শিখার চিন্তায় নন্দগোপাল বিভোর হয়ে থাকে। আজ সে নিজে কোথায়, আর শিখা কোথায়? শিখা হয়তো আজ আর পৃথিবীতে নেই; কিন্তু নন্দগোপাল আজও পৃথিবীর মাটিতে বসে শিখার ধ্যান করছে। শিখা আর নন্দগোপালের জীবনের কত কথা, কত কাহিনী নন্দগোপাল ওই সেই পুরোন পাণ্ডুলিপির মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। ওগুলো যদি একবার প্রকাশ পেত, ছাপার অক্ষরে শিখার হাতে গিয়ে ভুল ক্রমেও ওর একটা পাতা গিয়ে পড়তো, শিখা পড়ে বুঝতো; নন্দগোপাল আজও শিখাকে ভালবাসে, আজও তার কথা চিন্তা করে এই প্রবাসের নির্জনে বসে বসে। কিন্তু ও লেখা শুধু পাণ্ডুলিপি হয়েই থাকবে; একদিন পাতাগুলো ঝরে ঝরে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে; শিখাকে জানানো হবে না, শিখা জানতে পারবে না, নন্দগোপাল গেছে না আজও বেঁচে আছে,—স্মৃতির শতশত কাহিনীকে মনের মানসে আঁকড়ে ধরে।

পিয়ন এসে নন্দগোপালের হাতে নতুন একটা মাসিক পত্র তুলে দিল। নন্দগোপালের চিন্তার ঢেউ মাঝ পথে এসে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। আর কিছুতেই সে খেই ধরতে পারলো না। টুক্‌রোগুলোকে আর কিছুতেই জোড়া লাগাতে পারলো না। ভাবাটা কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে পড়লো, শিখার ছবিটা কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল। সুবিমলের চিন্তাও মাথায় প্রভাব বিস্তার করলো না। শত চেষ্টায়ও আর নন্দগোপাল পুরাতন চিন্তায় ফিরে যেতে পারছে না, একটা অস্বস্তি ভাব সারা মনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো!

নন্দগোপাল সারা বাগানটায় কয়েকবার পায়চারী করে বেড়াল, কই তবুতো আর মনটা থিথিয়ে পড়ছে না। জল বড় ঘোলাটে হয়ে পড়েছে। বেশ কিছু সময় চাই, সময় না হলে আবার ওই ঘোলা জল থিথিয়ে স্বচ্ছ হবে না। আবার স্বচ্ছ না হলে শিখা কিংবা সুবিমলের প্রতিবিম্ব তাতে ধরা দেবে না। নন্দগোপালের মনটা আজ সত্যি

কেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। যত সব উদ্ভট চিন্তা এসে মনের কুঠুরিতে জমা হয়ে একটা চিন্তাতে বিভোর হতে পারছে না সে। আবছা আবছা অনেক ছবি এক সঙ্গে ফুটে উঠছে। শিখার চিন্তা যেন একটুর জন্যে আড়ালে সরে গেছে। এ লুকোচুরির খেলায় নন্দগোপাল বারবার হেরে গেল। অগত্যা আবার চেয়ারটায় বসে এই নতুন মাসিক পত্রিকাটার পাতা উল্টোতে শুরু করলো সে।

দেখতে দেখতে সমালোচনার পাতাটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এবারও সুবিমল রায়ের নতুন বই-এর সমালোচনা। আবার নন্দগোপালের মন চলে গেল ওই বই-এর পাতায়। ধীরে ধীরে ভাল করে উচ্চারণ করে পড়তে শুরু করলো নন্দগোপাল। চোখটা বড় করে ভাল করে অক্ষরগুলো যেন চিনতে চেষ্টা করছে সে। গল্পের কাহিনীটা বেশ বড় করেই লিখে সমালোচক তার সমালোচনা করেছে। নন্দগোপাল তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বারবার কাহিনীটা পড়ে চলেছে. বাকী অংশে লেখা আছে,—"এই পুস্তকখানি পাঠ করবার সময় শ্রীযুক্ত রায়ের চমৎকার বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। লেখককে বুঝতে হলে তাঁর সাহিত্য-চিন্তার পশ্চাৎভূমি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্যক পরিচয় থাকা উচিত। তাঁর লেখায় বাংলার সাহিত্য-আন্দোলন এক নতুন আবিষ্কারের পথে রূপ নিয়ে চলেছে। তাঁর এ প্রচেষ্টা সার্থক। আমরা সমালোচকের পক্ষ থেকে তাঁকে বারবার অভিনন্দন জানাই।"

বইটা নন্দগোপালের হাত থেকে খসে পড়েছে। নন্দগোপাল নির্বাক ; কথা বলার শক্তি তাঁর ক্ষণেকের জন্যে শেষ হয়ে গেছে। চোখের জল বৃদ্ধের চিবুকের উপর নেমে এসেছে, বুকের উপরটা অশ্রুপ্লাবনে ভিজে গেছে। নন্দগোপাল মূক হয়ে আছে। কোনও কিছুই চিন্তা সে করতে পারছে না এখন। বুকটা ফাঁকা হয়ে গেছে,

ভেতরটা কেমন যেন হাল্কা হয়ে গেছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখের পাতাগুলো কেমন যেন স্তিমিত হয়ে পড়েছে ; আর কোনও শক্তি নেই যে সে আবার স্থির হয়ে উঠে বসে। শরীরটা আরো হেলে পড়েছে ওই ইজি চেয়ারটার উপর। সন্ধ্যে হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে দূরে। অদূরে স্বর্ণমন্দিরটায় আবার আলোর মালা ঝল্‌মল্‌ করছে। রাস্তায় জনসমাগম ধীরে ধীরে কমে আসছে। মন্দিরে লোকের ভীড় জমে উঠছে একটু একটু করে। পথের অটো-রিক্‌সাটা আস্তে আস্তে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে চলেছে।

নন্দগোপাল তেমনই নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছে ইজি-চেয়ারটায়। কতক্ষণ এই ভাবে কেটে গিয়েছিল, নন্দগোপাল বুঝতে পারেনি। যখন সম্বিত ফিরে পেয়ে একবার চারদিকে চেয়ে দেখলো, তখন রাত্রি বেশ গভীর হয়ে গেছে। একটা জনপ্রাণীরও সাড়া নেই কোথাও। পাঞ্জাবী চাকরটা বসে আছে নন্দগোপালের পাশে লণ্ঠনের আলোটা একটু কমিয়ে দিয়ে, হাতে একটা লম্বা লাঠি নিয়ে সতর্ক প্রহরির মত। বাবুকে ডাকেনি সে ; একটু অবাক বিস্ময়ে বড় বড় চোখে নন্দগোপালের দিকে তাকিয়ে আছে। অনন্ত প্রশ্ন তার চোখে-মুখে, কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা না করে সে শুধু বললো, বাবু খাবেন চলুন, রাত্রি দুটো বেজে গেছে। ভয়ে আপনাকে ডাকতে পারিনি। শরীর আপনার ভাল আছে তো ?

—হাঁ, ভালই আছে, তুই শুয়ে পড়, আমি আর আজ কিছুই খাব না ; আমিও শুয়ে পড়ছি !

—কিছুই খাবেন না ?

—হাঁ, এক গ্লাস জল দিয়ে যা। আর আমার ছোট-স্যুটকেসটায় দু'একটা জামাকাপড রেখে চাবি আর স্যুটকেস আমার ঘরে পাঠিয়ে দে ; কালই ভোরে আমি কলকাতায় যাব।

—ছোটবাবুর অসুখ করেছে ?

—না ! না ! সে ভালই আছে ; বহালতবিয়তেই কলকাতায় স্ফূর্তি করছে।

সে রাত্রে নন্দগোপালের চোখে আর ঘুম এলো না ; সে শুধু ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করেই কাটিয়ে দিল। কখন ভোর হয়, সূর্যের আলো কখন পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে এই হল নন্দগোপালের ভাবনা, চিন্তা সবই।

ভোরের ট্রেনেই কলকাতায় যেতে হবে ; এখুনি একবার সেখানে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে হবে তাকে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে চাকর, তার বাবুর জন্যে ছোট সুটকেসটা দিয়ে গেল। সে বেচারা কিছুই বুঝল না। নানা ভাবনা তার মাথায় কুণ্ডলি পাকাতে শুরু করলো। মনে মনে ভাবলো, বাবুতো কখনও এবাড়ী ছেড়ে কোথাও যাননি। কলকাতার নামও বাবুকে কোনও দিন বলতে শুনিনি। তবে আজ কেন হঠাৎ সেই কলকাতার জন্যে বাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ভয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হলনা অথবা বাবুর এ মানসিক অশান্তির কারণ না জানলে তারও মনের অশান্তি একটুও কমে আসছে না। ছোটবাবুতো তেমন নয় যে সাংঘাতিক কিছু একটা করে এমন দেবতার মত প্রভুর মনে আঘাত দেবে। কি জানি হতেও তো পারে ; কখন যে মানুষের মনে কি ঘটে তা কি আগে থাকতে কল্পনা করে বলে দেওয়া যায় ?

নয়

বাষ্পীয় ইঞ্জিনটা নন্দগোপালকে দ্রুততালে কলকাতার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। ট্রেনের গতি যত জোরই হোক না কেন নন্দগোপালের মন আরও দ্রুত কলকাতায় চলে এসেছে। এখনই সে সুবিমলকে একবার চোখে দেখতে চায়। তাকে জিজ্ঞাসা করতে চায়, কেন সে এমন কাজ করল ? নিশ্চয় সুবিমল নন্দগোপালের

সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! এতে আর নন্দগোপালের কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

•ট্রেনের কামরায় বসে বসে নন্দগোপাল মাঝে মাঝে উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠছে,—এ কাহিনী তার, আর কেউ এ কাহিনী জানতে পারে না। এ ঘটনা তার জীবনের নবীন দিনগুলোকে কেন্দ্র করে লেখা, এতটুকু কল্পনার ছোঁয়া নেই এতে। একটু রূপ রস দিয়েছে সে, এই যা। জীবনের প্রত্যেকটা কথা এতে আছে, শিখা মিত্র আর "সুর-মঞ্জিল"কে কেন্দ্র করে তার জীবনে যা যা ঘটেছে, তার মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জেগেছিল, তার অমৃতসরে চলে আসার পেছনে যে সকরুণ ইতিহাস জমা করা আছে, সবই এই উপন্যাসের পাতায় আছে। আর আছে প্রথম প্রহরের কথা, যারা যারা তার সংস্পর্শে এসে, তার সেই ছোট্ট জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ, দুঃখের সাথী হয়েছিল তাদের সকলের কথা। শিশু-মনে তখনকার ঘটনা কি ভাবে প্রতিবিম্বিত হতো তাও আছে এতে। এ কাহিনী তার। জীবনের প্রত্যেকটি কথা এতে আছে। এ তার ব্যক্তিগত ঘটনার কথা, অন্য কেউ এ কথা জানতে পারে না, জানলেও বলতে পারে না, কারণ তার মনে যা উদয় হয়েছিল, তা অন্যে জানবে কেমন করে?

মনের ছবি বাইরের কেউ দেখবে কি করে? চুরি, সুবিমল চুরি করেছে! নন্দগোপালের সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ধন চুরি করে নিজেই সে আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

মাঝে মাঝে নন্দগোপাল চেঁচিয়ে ওঠে, সুবিমল এ তুই কি করলি! আমার সমস্ত জীবনের তিল তিল করে সঞ্চয় করা সব কিছু তুই লুটে নিয়ে গেলি! এ কি হল? সুবিমল, আমি তোকে বিশ্বাস করেছিলুম; পিতার মত একটু একটু করে তোকে বড় করে তুললুম; রাস্তায় ভেসে বেড়াতিস্, ঘরে আশ্রয় দিলুম। আমার সঞ্চিত সবকিছু তোকে মানুষ করার পেছনে ব্যয় করে আমি নিঃস্ব হয়ে গেলুম। শুধু এই পাণ্ডুলিপি ক'টা যখের ধনের মত বুড়ো বয়সে আগলে বসেছিলুম,

এও তোর সহ্য হল না! আমায় মিথ্যে লোভ দেখিয়ে, বড় বড় কথা বলে বৃদ্ধকে ভুলিয়ে তুই শেষে চুরি করে নিজের নামে প্রকাশ করে দিলি! হায়! আর কিছু দিন অপেক্ষা করলি নে কেন? আমি যখন এই পৃথিবীতে থাকতুম না, যখন আমি দেখতে আসতুম না, আমার পাণ্ডুলিপি কি হল, তখন তুই নিজের নামে প্রকাশ করলি না কেন? লোভের মাত্রা এতদূর বেড়ে গেল যে, কিছুকাল অপেক্ষা করে থাকাও তোর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো, পৃথিবীর এইটাই বোধ হয় নিয়ম। চিরকাল এমনই বোধ হয় চলে আসছে। যৌবনে শিখা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; তাকে বিশ্বাস করেছিলুম, সে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছে। আর বার্ধক্যে তোকে বিশ্বাস করেছিলুম, তুইও উপযুক্ত পুরস্কার দিলি। প্রতিজ্ঞা আমার রইল না, ভেবেছিলুম এ জীবনে কলকাতার বিষাক্ত আবহাওয়ায় আর ফিরে আসবো না, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওই অমৃতসরেই কাটিয়ে দেব, কিন্তু তা হল না। সুবিমল, তুই আমার সে প্রতিজ্ঞাও ভাঙ্গার ব্যবস্থা করে দিলি। বিশ্বাসের প্রতিদান এমনি করে দিতে হয়, না? বেশ তাই হোক, বৃদ্ধের এ বুকভরা দীর্ঘশ্বাসে তোর কোনও ক্ষতি হবে কিনা জানিনা, যদি হয় তো বুঝবি মানুষকে আঘাত দিলে, আবার সে আঘাত ঠিকই ফিরে পেতে হয়। তোকে একদিন না একদিন অনুশোচনা করতে হবে, অনুতাপের আগুনে তোর সারা দেহ মন একটু একটু করে জ্বলবে। শিখাও ঠিক এমনি অনুতাপের আগুনে জ্বলছে, এ আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি। সারাজীবন তারও নিশ্চয় কেঁদে কেঁদে কেটেছে, তোরও কাটবে। আজ হয়তো বুঝতে পারবি না, সম্মানের উচ্চ শিখরে হয়তো এখন পরম আনন্দে তোর দিনগুলো কেটে যাচ্ছে, কিন্তু বেশীদিন নয়, এমন দিন আসবে যখন লজ্জায় ঘৃণায় তোর মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হবে, কিন্তু তখন আর তোর কোনও উপায় থাকবে না, তোর সর্বাঙ্গে তখন ব্যভিচারের চিহ্ন ছড়িয়ে পড়বে, ঢাকবি কোনখানে?

ট্রেন ছুটে চলেছে, নন্দগোপাল ভাবছে, প্রথমেই তাকে প্রকাশকের ঠিকানায় ছুটে যেতে হবে, কারণ আসল ঠিকানা তো সুবিমল তাকে জানায়নি। লিখেছিল, থাকার কোথাও ঠিক নেই, যাযাবরের মত তাকে পথে পথে ঘুরতে হচ্ছে। শয়তান! শয়তানের চিঠি আর প্রতি-মাসের টাকা তো সে প্রকাশকের ঠিকানায়ই পাঠিয়ে এসেছে। প্রথমেই যেতে হবে সেখানে, যেমন করে হোক ঠিকানা সেখান থেকে নিতেই হবে।

ইঞ্জিন ধীরে ধীরে কলকাতার মাটি স্পর্শ করলো। সেই কলকাতা মহানগরী। বহুযুগ পরে নন্দগোপাল আবার কলকাতার মাটি স্পর্শ করলো। তার মনটা কেমন যেন একটু বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ক্ষণিকের জন্যে প্রথম জীবনের দিনগুলো আবার মনে পড়ে যাচ্ছে। স্টেশনটা আজও তো ঠিক তেমনই আছে! ঠিক আগের মত জনতার কোলাহল, যাত্রীর ছোটাছুটি, কুলিদের কর্ম-চাঞ্চল্য, দাঁড়ান ইঞ্জিনটার হিস্ হিস্ শব্দ, কোথাও তো এতটুকু পরিবর্তন নেই। পরিপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে নন্দগোপালের নিজের, বিগত যৌবন, পক্ককেশ, লোমচর্ম, আর বার্ধক্যের শক্তিহীনতা। নন্দগোপাল তার জীবনের প্রথম দিনগুলোয় ফিরে যেতে চাইল। অতীতের ভালয়-মন্দয় মেশান স্মৃতিগুলোকে আবার আঁকড়ে ধরতে চাইল, কিন্তু হায়! সে কিছুই ফিরে পাবে না, তার এ আকুলি-বিকুলির দিকে কেউ একবার সকরুণ সমবেদনা জানানও প্রয়োজন বোধ করবে না।

ট্রামটা কলেজস্কোয়ারের দিকে ছুটে চলেছে, ট্রামের রংটার শুধু পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে ধরা দিল, আর সবই এক। যেমনটি দেখেছিল ঠিক তেমনটি, বড় হাওড়া ব্রীজটাও তার মনে রং ধরাতে পারলো না। নন্দগোপালের মনটা এখন আবার ফিরে গেছে তার আত্মচিন্তায়। বাইরের কিছু আর তার মনে রেখাপাত করছে না।

প্রকাশকের নামটা নন্দগোপালের কাছে নতুন নয়। অনেকদিন থেকেই শুনে আসছে সে ও নামটা। ওদের প্রকাশিত অনেক বইই সে এ জীবনে পড়েছে। ভালও লেগেছে অনেক লেখা, অনেক লেখা আজও তার মনে বেশ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। ভুলতে পারেনি অনেক লেখকের নায়ক নায়িকাকে। অনেকের জীবন কথা নন্দগোপালের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। তবে সুবিমল রায়ের নায়ক-নায়িকার কথা যেভাবে মিলেছে, নন্দগোপালের জীবনের সঙ্গে আর কোনও লেখকের নায়ক-নায়িকা সেভাবে মেলেনি, মিলতে পারে না। এই মেলাই তো নন্দগোপালের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী!

প্রকাশকের কাছে এসে নন্দগোপাল সবিনয়ে দাঁড়াল। কাউন্টারের মধ্যে থেকে শিশিরবাবু কি ভেবে বৃদ্ধকে ভেতরে আসতে ব'লে, চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন।

নন্দগোপাল চেয়ারটা টেনে নিয়ে কোনক্রমে বসে পড়লো. কথা বলার ক্ষমতা সে ক্ষণিকের জন্যে হারিয়ে ফেলেছে, কি বলবে সে. কেন এখানে এসেছে নন্দগোপাল? সুবিমলের আসল পরিচয় প্রকাশ করে দেবে কি না? না, সবকিছু আপাততঃ চেপে গিয়ে শুধু ঠিকানাটা চেয়ে নেবে সে। ঠিকানা যদি প্রকাশক না দেন তবে কি বলে অনুরোধ করবে নন্দগোপাল।

এতগুলো প্রশ্ন নন্দগোপালের মনে একসঙ্গে এসে উপস্থিত হল। মূক হয়ে রইল নন্দগোপাল। শিশিরবাবু পাখার গতিটা একটু বাড়িয়ে দিতে বললেন বাসদেওকে!

হিন্দুস্থানী চাকর বাসদেও পাখার গতিটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে একবোঝা বই নিয়ে কোথায় বের হয়ে গেল।

বুককেশটায় সুবিমল রায়ের অনেকগুলো বই নন্দগোপালের চোখে পড়লো। নন্দগোপাল আবার একবার চঞ্চল হয়ে উঠলো; কথা বলার ক্ষমতা আবার কিছুক্ষণের জন্যে লোপ পেল তার।

শিশিরবাবু অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন নন্দ-

গোপালের দিকে। এবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, আপনাকে খুব অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে? এককাপ চা আনতে বলব?

—না থাক।

—কি চাই বলুন?

—সুবিমলের ঠিকানা।

—কে সুবিমল?

—ওই আপনাদের গল্প-লেখক সুবিমল রায়। শিশিরবাবু এবার বিব্রতবোধ করলেন, বৃদ্ধের মুখের উপর কোনও কথা হঠাৎ তিনি বলতে পারলেন না, পরে ধীরে ধীরে জানালেন,—তাঁর ঠিকানা তো আমরা কাউকে দিই না, তাঁর নিষেধ আছে।

—আমাকেও দেবেন না?

—কিছু মনে করবেন না; আপনি তাঁর কে হন যদি দয়া করে জানান?

—কেউ না। নন্দগোপাল হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

—তবে তো ঠিকানা দেওয়া সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

—কেন? এ নিষেধ কেন?

—তাতো জানি না, তবে মনে হয়; তাঁর লেখায় ব্যাঘাত হয়।

—কিচ্ছু হয় না, সব ধাপ্পাবাজী।

—কি বলছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলছি! আমি তাকে চিনি না? ছেলের মত করে মানুষ করলুম!

শিশিরবাবু বৃদ্ধকে উন্মাদ ভেবে একটু হাসলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার নামটা জানতে পারি কি?

—নন্দগোপাল রায়।

—ওঃ। আপনি তো প্রতিমাসে টাকা পাঠান তাঁকে অমৃতসর থেকে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ?

—চিঠিও পাঠান মাঝে মাঝে।

—হ্যাঁ।

নিশ্চয় ঠিকানা দেবো আপনাকে, আপনি সুবিমল বাবুর জ্যাঠা-মশাই, একথা আগে বলেন নি কেন? ছিঃ ছিঃ, কিছু মনে করবেন না। এই নিন্ ঠিকানা।

শিশিরবাবু ঠিকানা লেখা একটা কার্ড নন্দগোপালের হাতে তুলে দিলেন।

নন্দগোপাল নমস্কার করে রাস্তায় নেমে এলো।

দশ

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মিলা।

সুবিমলের ড্রইংরুমটায় আজ রাত্রির স্তব্ধতা বিরাজ করছে। সুবিমল কোনও কথা বলছে না। খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে আছে সে, স্তব্ধ গম্ভীর। মাঝে মাঝে সুবিমলের রক্তাভ গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হয়ে উঠছে। বাংলার জলহাওয়ায় তখনও একটু একটু ঠাণ্ডা আছে, তবুও ঘেমে ঘেমে উঠছে সুবিমল। অনেক চিন্তা, অনেক কথা তার মনে ভেসে উঠছে; কি করবে আর কি করবে না কিছুই ভেবে পাচ্ছে না সে; তবুও বাইরে কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করছে না সে, যতটুকু পারে গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করছে সে, তবুও তার মুখের দিকে তাকালে যে কেহই বুঝতে পারবে সুবিমলের মনের মধ্যে কালবৈশাখীর রুদ্রতাণ্ডব নৃত্য করে চলেছে। বিরাট তুফান, একটা বড় রকমের পরিবর্তন এখুনি হয়ে যেতে পারে। তবুও অচঞ্চল সে; অসহিষ্ণু হয়ে এখুনি সে একটা কিছু করে ফেলতে চায় না। মাঝে মাঝে অমৃতসরের কথা চিন্তা করছে সে; সেখানে হঠাৎ চলে গেলে কেমন হয়? বৃদ্ধ এখনও হয়তো সরল বিশ্বাসে তাকে কোলে তুলে নেবে। বেশ তাই করবে সুবিমল, বিপদের সময়

মুক্তির একটা পথ পাওয়া গেল ; সাহসে বুক বাঁধলো সে। কোনও কিছুতেই পরোয়া সে করবে না, মিলা যতই কাঁদুক, যতই মেয়েলী সুরে কথা বলুক, যতই ধর্মের উপদেশ দিক, আবার যতই তাকে চিৎকার করে জানাক,—তুমি না সাহিত্যিক, হৃদয় বলে কি তোমার কোনও পদার্থ নেই ? এতই নিষ্ঠুর তুমি, এতই পাষাণ ! না না তুমি এত ছোট হয়ো না, আমায় পথে নামিয়েছ। বেশ, কিন্তু যে আসছে, তার কি করলে ? আগন্তুকের পরিচয় কি হবে ? বল ? চুপ করে থেকো না, আমার কথার জবাব দাও ? ওগো শুনতে পাচ্ছ না ? আমার কথার জবাব দাও ? কথা বল ! নাম-হীন, গোত্র-হীন, মা হয়ে আমি তাকে দেখতে পারব না ; মা হয়ে সইতে পারব না এতবড় লজ্জা ; এখনও চুপ করে রইলে, একটা কথারও জবাব তুমি দেবে না ? এত ছোট তুমি ; হায় ! এ কি হ'ল !

আবার কেঁদে উঠলো মিলা, কোনও দিন জীবনে এমন করে কাঁদেনি সে, এমন গুমরে গুমরে কাঁদতে তার লজ্জা করছে, বিশেষ করে সুবিমলের কাছে। তবুও কেঁদে চলেছে সে, সর্বস্ব সে হারাতে বসেছে ; কেন সে এমন ভুল করলো সেকথা চিন্তা করার সময় এখন নেই। অসহ্য একটা বেদনায় হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠছে ! সুবিমল যে পশুর চেয়ে অধম, সে কথা সে মিলাকে একবারও জানালনা কেন ? এমন করে পথে বসানোর কি অর্থ আছে ? শিশুর মত কেঁদে কেঁদে উঠছে সে, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে সুবিমলকে,— সুবিমল, তুমি কেন এমন করলে ? কি ক্ষতি করেছি তোমার ? তুমি যা চেয়েছ আমি তাই তো দিয়েছি, বিশ্বাস করেছিলুম, এই কি তার পুরস্কার !

মিলা এবার ছুটে গিয়ে সুবিমলের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্‌ল,— সুবিমল আশ্রয় দাও। আমার যে এখন কেউ নেই, এ কলঙ্ক নিয়ে আমি পথে বের হব কেমন করে ? আমায় বিয়ে না কর, অন্ততঃ যে কদিন বেঁচে থাকি একটা ঝি-এর কাজ করার জন্যে তোমার

বাড়ীতে আড়াল করে রাখ ; কেউ যেন না দেখতে পায় ; কেউ যেন না জানতে পারে মিলা কোথায় গেল ? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, সুজন এসে যদি আমার খোঁজ করে বলো মিলা মরে গেছে, কোনও দিন তাকে পৃথিবীর আলোয় কেউ দেখতে পাবে না।

মিলা আরও বলে চলে,—কিগো, আমার কথার কি কোনও জবাব দেবে না ? অন্যায় করেছি আমি, এ অন্যায়ের কি কোন ক্ষমা নেই ? বল ? একটা কিছু বল ?

ঘৃণাভরে সুবিমল উত্তর দেয়,—এই বিজ্ঞানের যুগে গেঁয়ো-মেয়েদের মত প্যানপ্যানানি আমার ভাল লাগে না মিলা ! সব কিছুর একটা সীমা আছে। এতটা ন্যাকামী আমি পছন্দ করি না। একটু স্থির হয়ে আমায় বসতে দেবে না, তোমার একঘেয়ে কান্নাই শুধু সকাল থেকে আমায় শুনে যেতে হবে ? অনেকবার শুনেছি তোমার কথা, এবার আমায় নিষ্কৃতি দাও মিলা। গেঁয়োমি এখনও তোমার গেল না ?

সুবিমল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সারা ঘরটায় পায়চারী করতে লাগলো, আর কোনও কথা বলা সে প্রয়োজন বোধ করলো না। ভাবলো মিলার যদি লজ্জা থাকে, এতেই সে চলে যাবে, আর কিছু বলতে হবে না। ঠিকই বলেছে সে, এখনও সময় আছে, যদি বলে ডাক্তারের পরামর্শে এখনও কিছু কাজ হতে পারে। বিজ্ঞান মানুষকে কি না দিয়েছে ? সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই দিতে তো কার্পণ্য করেনি, মিলার জীবনের সংশয় কিছুটা আছে হয়তো। কিন্তু ওর বেঁচে থেকে লাভই বা কি ? ওতো জানে আমি ওকে কোনওদিনই বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চাই না ; একটা মেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধা আমার পোষাবে না। জীবনটা ভোগ করতে হবে। সম্মান তো প্রচুর পেয়েছে সে ; এবার সেই পাওয়ার সদ্ব্যবহার না করলে জীবনটাই তো বৃথা। মিলাকে পেয়ে বেশ কিছুদিন স্ফূর্তি করা গেল, এবার তার যাওয়ার পালা। কত আসবে কত যাবে, কত ঘাত-প্রতিঘাতের

মধ্যে দিয়ে জীবনটা কাটবে তার। তা না হলে এ জীবনের মূল্য কি? কত দেখতে হবে, কত জানতে হবে। এখনও সারাটা জীবন পড়ে আছে, একটা মেয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে বোকামি আর কি আছে! সুবিমল অত বোকা নয়, রাস্তা থেকে মিনারে উঠে এসেছে সে। আরও আরও উপরে উঠতে হবে। তারপর…

তারপর মিলা আবার একঘেয়ে প্যানপ্যানানি শুরু করেছে,— সুবিমল তুমি কি মানুষ? তুমি সাহিত্যিক, তোমার বাইরেটা যত ভাল, অন্তরটা ঠিক ততই খারাপ। কেউ তোমার বাইরের ভদ্ররূপ দেখে ভেতরের নোংরা, কুৎসিত অরূপকে চিনতে পারে না; আমিও ভুল করেছি। চিনতে পারিনি তোমায়, তোমার লেখা দেখে মনে হয়েছিল, তুমি কত মহৎ-ই না হতে পার! এখন বুঝেছি, ওগুলো তোমার ওই পাপ হাত থেকে বের হয়নি, হতে পারে না। জানিনা, তুমি আমার মতই কার সর্বনাশ করে ওগুলো হস্তগত করেছ, নিজের নামে প্রকাশ করেছ। শিল্পীদের মন এত ছোট হতে পারে না, তাদের মনে ঔদার্য্য না থাকলে সকলকে চিনবে কি করে? আমার কথাগুলো এখন তোমার খুব খারাপ লাগছে, না? এখন আমার মরণ-কামনা করছো মনে মনে এই তো? মৃত্যু তো আমার হয়েছে। তোমার জালে যখনই ধরা দিয়েছি তখনই তো আমার সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আর আমার কিছুই তো বাকী রাখনি; আর কত জনের যে আমার মত অবস্থা হয়েছে তাই ভাবছি; বিশ্বাস! বিশ্বাস করা উচিত নয়, বিশেষ করে তোমাদের মত পুরুষদের, আমার সব গেছে। হৃদয় বলে কি তোমার মধ্যে কোনও পদার্থ নেই! রাস্তার-আঁস্তাকুড়ে এমনি করেই কি আমায় ফেলে দেবে? মনুষ্যত্বের কোনও বালাই কি নেই?

ঝড়ের মত নন্দগোপাল ঘরে ঢুকে বলে উঠলো—মনুষ্যত্বের বালাই চাও অমানুষের কাছে? মানুষের চামড়া গায়ে থাকলেই কি মানুষ হওয়া যায়? কোনওদিন কি ভেবেছি, দুধ কলা দিয়ে আমি এত

দিন কালসাপ পুষেছি ! আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সমস্তই শুনেছি। চোর ও, আমার জীবনের সবকিছু চুরি করেছে ! তোমার সর্বনাশ করে তোমায় আঁস্তাকুড়ে নামিয়ে এনেছে ; এটা তো স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক হতো ও যদি তোমায় ঘরে তুলতো ! নীচ যারা হয় তাদের অনেক দোষই থাকে ; অনেক অন্যায় তারা জীবনে করে। কার কাছে মা তুমি মনুষ্যত্বের কথা বলছ ?

সুবিনল এখানে নন্দগোপালকে একেবারেই আশা করেনি, মনে মনে সে তো অমৃতসরের স্বর্গসুখ কল্পনা করছিল ; ভাবছিল সত্যিকার বিপদ যদি হঠাৎ দেখা দেয় অমৃতসরেই তার একমাত্র আশ্রয়। যেখানে গেলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্তে সে কাটিয়ে দিতে পারবে। মিলাকে নিয়েই এখন তার যত জ্বালা ; মেয়েটা সত্যিই বেহায়া, অন্যমেয়ে হলে এতক্ষণ লজ্জায় গলায় দড়ি দিত, কিম্বা পটাসিয়াম-সায়নাইড্ খেয়ে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেত। কিন্তু আজ যেন মিলা কিছুতেই এবাড়ী ছাড়তে চাইছে না, ঘ্যান-ঘ্যান করছে সেই সকাল থেকে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলো মিলা ; এসব মেয়ের মরণও জোটে না। মিলার না হয় একটা সর্বনাশ হয়েছে, সে এসে প্যানপ্যান করছে। কিন্তু এই বুড়োটা, ঠিক সময়ে আবার এসে জুটলো কোথা থেকে ? বুড়ো আসার কি আর সময় পেল না ! কেই বা খবর দিলে ওকে ; বুড়ো কি ওর বইগুলো পড়েছে ? পড়েছে হয়তো। এতদিন বোধহয় ওই সবই করেছে ! টাকাও পাঠিয়েছে, আবার তলে তলে বইগুলো নিয়ে কি করছি তার খবরও নিয়েছে, আচ্ছা ধুরন্ধর তো ! ঠিক আছে, ওর ধুরন্ধরত্ব আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা শিশিরবাবুটা কি ! ওই বোধহর ঠিকানা দিয়েছে। আমি কত করে বলে দিয়েছি আমার ঠিকানা কেউ যেন না জানতে পারে, কেউ যেন না জানে আমি কোথায় আছি ! সব-গুলোই আমার পেছনে লেগেছে। আচ্ছা, বুড়ো আবার প্রকাশককে বলেনি তো, যে আমি ওগুলো স্রেফ্ নকল করে চালিয়ে দিচ্ছি

আমার নামে। কে জানে বুড়ো যা সেয়ানা সবই করতে পারে। যাক্, দেখাই যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! রাগে জ্বলতে লাগলো সুবিমল, চিৎকার করে বলে উঠলো, জ্যাঠাবাবু আপনি কি পাগল হলেন? কি যা তা বলে চলেছেন? মাথা খারাপ হল নাকি? বুড়ো বয়সে কি আবার ভিমরতি ধরলো? সর্বনাশ! মিলার কি হল? আর হঠাৎ চোর চোর বলে চিৎকার শুরু করে দিলেন কেন? কে চোর? কি চুরি করেছে? কে?

—কে চোর? কি চুরি করেছে? একেবারে ন্যাকা, যেন কিছুই জানেন না উনি! তুই চোর। মাথা খারাপ আমার একটুও হয়নি, ভিমরতি এখনও ধরেনি! রাস্তায় রাস্তায় ভেসে বেড়াতিস, পথের ডাস্টবিন থেকে তোকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতে হতো; নয় তো একটু দুধের অভাবে কোন্ জন্মে রাস্তার ধারে মরে পড়ে থাক্‌তিস; ঘরে তুল্‌লুম, মানুষ করলুম; লেখাপড়া শিখিয়ে মগজে বুদ্ধি ধরালুম। আমি নিজে নিঃস্ব হয়ে তোকে সর্বস্ব দিয়ে বড় করলুম। তুই কিনা আমার সর্বনাশ করলি! জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় আমার ওই বই ক'খানা, যা আমি সারাজীবন ধরে লিখলুম আমার বুকের অর্ধেক রক্ত দিয়ে; সেগুলো আত্মসাৎ করতে তোর একমুহূর্তও দেরী সইল না! হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েই সদ্ব্যবহার করলি! তুই চোর নয় তবে চোর কে? আমার জীবনের সব সঞ্চয় তুইই তো চুরি করে নিলি। আর এই ফুলের মত সুন্দর মেয়েটার সবকিছু লুটে নিয়ে একে পথে নামাতে তোর একটুও দ্বিধা হচ্ছে না! হায়! আমি এ কী করেছি, কাকে একটু একটু করে ভবিষ্যৎ ভেবে মানুষ করেছি! ঈশ্বর! আমার একি করলেন! এমন কি পাপ আমি এ জীবনে করেছি?

মিলা অবাক হয়ে শুনছিল। আর বৃদ্ধের চোখে জল উবছে পড়ছিল। নন্দগোপাল বলতে বলতে ভাবলো, এর-সঙ্গে কথা বলে নিজেকে ছোট করে লাভ নেই; এখনও বেঁচে আছে সে, সুবিমলকে উপযুক্ত শাস্তিই সে দিয়ে যাবে, যাতে সুবিমল সারাজীবন ধরে ভাবে

এ অন্যায়ের কথা, অনুতাপের আগুনে তিলে তিলে জ্বলে মরবে। বুঝবে সে এখনও আইন আছে, অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তিও আছে, উপযুক্ত ব্যবস্থা আজও বর্তমান। সুবিমল যা করেছে, তা সীমাহীন অন্যায়; এ-অন্যায়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। কিন্তু মিলা বেচারার কি হবে? ওর তো আর কোনও পথ খোলা নেই। হ্যাঁ, আছে মৃত্যু। মরাই ওর ভাল। সুবিমলকে এতটুকু যাচাই করে দেখলো না, এতটুকু চিন্তাও ও করলো না, সুবিমলের—মনের একটা সংবাদ জানাও প্রয়োজন বোধ করলো না; এতো বোকা! বোকা ছাড়া আর কি? মিষ্টি কথায় একেবারে গলে গেল। একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করলো না। সুবিমলের উপযুক্ত শাস্তিতে মিলা সুখী হবে কি? নাও হতে পারে! সাধে বলে মেয়ে। হয়তো এর পরেও বলবে, না নন্দগোপালবাবু ভুল ও করেছে, আপনি মহৎ, ওকে ক্ষমা করুন? হায়রে! ক্ষমা এর নেই, এ অপরাধের কোনও ক্ষমা থাকতে পারে না!

নন্দগোপালের মত সুবিমলও এতক্ষণ কিসব ভাবছিল, এবার বলে উঠলো,—জ্যাঠাবাবু, আপনার আর কি কিছু বলার আছে? যদি না থাকে, তবে যেতে পারেন, এ বাড়ী আমার, এখানে দাঁড়িয়ে আমায় আপনি অপমান করতে পারেন না?

—কার বাড়ী, তোর? আমার রক্ত বিক্রি করা টাকায় তুই এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছিস্ এই-তো? চমৎকার, এতদিন তোর এই সুন্দর রূপটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলিস্ বাবা? মুখোস আগে খুললে তো বুড়োর আর এই মেয়েটার এ-হাল হতো না! বুড়োর সর্বস্ব চুরি করে এই নিরীহ মেয়েটার সর্বনাশ করে, তুই লেখকদের নামের কলঙ্ক বাড়িয়েছিস্, আর তোকে বেশীদূর যেতে হবে না, তোর ব্যবস্থা আমি এখুনই পাকাকরে ফেল্‌বো। কার বাড়ী, আর কে থাকে তখন একটা মীমাংসায় আসা যাবে।

—জ্যাঠাবাবু!

—ধমক দিচ্ছিস কাকে ? আমাকে কি ওই একরত্তি মেয়ে ভেবেছিস ? খুব খানিকটা হাসলো নন্দগোপাল ; দুঃখের মধ্যেও একবার হেসে নিলো সে।

এ হাসি সুবিমলের কাছে আরও অসহ্য হয়ে উঠলো। সামনেই সিগারেটকেসটা ছিল, সুবিমল হাসি সহ্য করতে না পেরে সেটা ছুঁড়ে মারলো নন্দগোপালের দিকে। বৃদ্ধ নন্দগোপালের দুঃখের এ হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। নন্দগোপাল একবার আর্তচিৎকার করে বসে পড়লো, রক্ত ঝরে পড়ছে বুকের উপর।

সুবিমল একবার তাকিয়ে দেখলো। এবার হাসছে সুবিমল, এ হাসি পৈশাচিক হাসি, সুবিমল যে এমন হাসতে পারে মিলা তা জানতো না। সে ছুটে গেল নন্দগোপালের কাছে ; কাপড়ের বাড়তি অংশটা দিয়ে মাথার ক্ষতটা চেপে ধরলো মিলা। বুড়োর প্রতি এতটা দরদ সুবিমল সহ্য করতে পারলো না ; মনে মনে জ্বলে উঠছিল সে, নন্দগোপালকে সে এখন একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। তার উপর আবার মিলার সোহাগ, তাকে উন্মাদের মত করে তুললো। কি করবে সে ? দু-একবার নিজের মাথার চুল নিজেই ছিঁড়তে শুরু করলো। আবার ঘরের মধ্যে জোরে জোরে পায়চারী করতে লাগলো। সিগারেটকেসটা থেকে ঘরের মেঝেতে সিগারেট ছড়িয়ে পড়েছে, সুবিমল একটা সিগারেট তুলে নিয়ে দু-তিনবার ধরাবার চেষ্টা করলো, ধরাতে পারলো না সে। হাত কাঁপছে, সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নন্দগোপালের দিকে ছুটে গেল,—মিলা তখন নন্দগোপালকে জিজ্ঞাসা করছে,—খুব কষ্ট হচ্ছে জ্যাঠাবাবু ?

—হ্যাঁ, হচ্ছে। খুব সোহাগ হয়েছে ; আর অত সোহাগে কাজ নেই। সুবিমল এই কথাগুলো বলেই নন্দগোপালের হাত দু'টো ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ছোট একটা ঘরে ; মিলা বাধা দিতে গেল, ধাক্কা দিয়ে মিলাকে ফেলে দিল সুবিমল ; মিলা পড়ে গেল।

এতক্ষণ নিজেকে ভুলে গিয়েছিল সে ; আবার সব মনে পড়ে গেল। মিলা আবার কেঁদে উঠলো।

সুবিমল দরজায় একটা চাবি ঝুলিয়ে দিয়ে মিলাকে হুকুম করলো,—বেরিয়ে যাও!

মিলা একবার সুবিমলের দিকে চাইল সকরুণ চোখে, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল ; সুবিমল একবার তার দিকে চেয়ে চাকরকে আবার হুকুম করলো,—ও চলে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দিবি। কাউকে আসতে দিবি না। আমি উপরে যাচ্ছি ; বোতলটা নিয়ে আয়।

মিলা এবার রাস্তায় নেমে এলো, ফুটপাতের ধারে একটু বসলো, সবাই দেখছে মিলাকে : কিন্তু মিলার চোখে শুধু জল।

সুবিমলের বাইরের দরজা চাকরটা বন্ধ করে দিল। মিলার জীবনের সব দরজা এবার বন্ধ হয়ে গেল। পথে নেমে এসেছে সে।

এগার

গারদখানায় বন্দী হয়ে আছে নন্দগোপাল রায়।

গারদখানা নয়তো কি ? ছোট একটা জানালা আছে মাঠের দিকে, সেখানে সুবিমল রায়ের ছোট ফুলের বাগান ; রাজ্যের বিলিতি সিজিন ফুলের গাছ জড়ো করা হয়েছে। একটা ঠিকে মালি আছে ; রোজ বিকালে এসে সে গাছগুলোর নিচের মাটি আলগা করে দেয়, জল দেয় পাইপের সাহায্যে, আর জীর্ণপাতাগুলো গাছ থেকে কেটে নিয়ে পরিষ্কার করে রাখে। গারদখানা সুবিমল রায়ের আগের ভাড়াটের ভাঁড়ার ছিল ; বড় বড় ইঁদুর এখনও এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করে। নন্দগোপাল তাদের স্বাধীন চলাফেরায় বাধাদান করতে এখানে উপস্থিত হয়েছে। ঘরে

লম্বা একটা ক্যালেণ্ডার ঝোলান আছে এই যা। অনেক অনুনয়ের পর সুবিমলের চাকর নন্দগোপালকে পুরোন খবরের কাগজ, কয়েক টুক্‌রো সাদা কাগজ আর একটা পেনসিল এনে দিয়েছিল। পেনসিলটা নন্দগোপালের খুব কাজে লেগেছে, সে রোজই ক্যালেণ্ডারে তারিখটা পেনসিলটা দিয়ে কেটে কেটে রাখে। বুঝতে পারে নন্দগোপাল, কতদিন তার এই নরকে কেটেছে। অনেকদিনই এখানে কেটে গেল, ক্যালেণ্ডারের পাতা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ছুটো পাতা আরও আছে ; এ ছুটো শেষ হয়ে গেলে আর নতুন ক্যালেণ্ডার আসবে না। কতযুগ কেটে যাবে, কতদিন এই পৃথিবীতে নতুন সূর্যের আলো আসবে, আবার অন্ধকার এসে আলোকে মুছে দিয়ে যাবে, নন্দগোপাল তার কোনও হিসাব রাখা আর হয় তো প্রয়োজন বোধ করবে না। সে যেন চিরকালের জন্যে এখানে বন্দী হতে এসেছে ; তার জীবনে আর কোনদিন নতুন সূর্য উঠবে না। অন্ধকারই শুধু সারাক্ষণ তার সামনে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্ধকারে শুধু অন্ধের মত পথ খুঁজে খুঁজে তালাবন্ধ দরজায় মাথা ঠুকে আবার বসে পড়বে সে! মাথার ক্ষতটা শুকিয়ে এসেছে, সেখানে খানিকটা মরচে ধরে গেছে, দরজায় ধাক্কা খেয়ে মরচেটা চটে যাবে আবার, রক্ত ঝরবে নন্দগোপালের মাথা থেকে। ক্ষতটা আবার দগদগে হয়ে পুরোন দিনের অতীত স্মৃতি মনে পড়িয়ে দেবে। নন্দগোপাল মনে মনে ভাববে, এমনি একটা দিনে সুবিমল তার মাথায় সিগারেট কেসটা ছুড়ে মেরেছিল, হাত ধরে টানতে টানতে বন্দী করেছিল এই অন্ধকার ঘরটার মধ্যে। সেদিন ছোট একটা মেয়ে এসে আদর করে বলেছিল,—জ্যাঠাবাবু, খুব কষ্ট হচ্ছে? সুবিমল তখনই পরিহাস করে বলেছিল, হ্যাঁ হচ্ছে! খুব সোহাগ হয়েছে ; আর সোহাগে কাজ নেই। আর কেউ এমনি সোহাগ করে, একটা কথাও জিজ্ঞাসা করবে না। সুবিমলের রূঢ় কথাও তার কানে এসে পৌছুবে না।

অনেকদিন নন্দগোপাল মিলাকে দেখেনি। বেচারা মেয়েটা সেই

যে রাস্তায় নেমে গেল, আর তার কোনও সংবাদ পায়নি বৃদ্ধ নন্দগোপাল রায়। তার যে কি হল! আত্মহত্যা করলো কিনা তারও একটা সংবাদ পায়নি সে। পর পর কয়েকদিনের পুরোন কাগজগুলো হাতড়ে হাতড়ে মিলার আত্মহত্যার একটা সংবাদও সে সংগ্রহ করতে পারেনি। আত্মহত্যার খবর যে দু-একটা পায়নি নন্দগোপাল তা নয়; পেয়েছিল, তবে সেগুলো ক্ষুধার জ্বালায়। ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা ও তো একটা সাধারণ ঘটনা। এ সংবাদে আর কোনও নতুনত্ব পাওয়া যায় না, স্বাধীন দেশে ওরকম দু'একটা আত্মহত্যা না হলে রাষ্ট্রের তহবিল যে শেষ হয়ে যাবে! সবই যদিও বুভুক্ষা লোকগুলোর জন্যে খরচ হয়ে যায়, তবে আর এত কষ্ট করে রাজ্য পরিচালনার দরকার কি? এ আত্মহত্যার সংবাদ নন্দগোপাল জানতে চায়নি। জানতে চেয়েছিল মিলার আত্মহত্যার একটা সুখবর; কিন্তু তাও তার ভাগ্যে জুটলো না। কেমন করেই বা জুটবে, সব খবর তো কাগজওয়ালাদের সংগ্রহ-করা সম্ভব নয়। এই যে একজন লেখক আজ এই গারদখানায় বন্দী হয়ে আছে। আর যে চোর, তার সর্বস্ব চুরি করে নিয়েছে, দেশ শুদ্ধ লোক সেই চোরকে নিয়ে নাচছে, আর নাচাচ্ছে ওই কাগজওয়ালারা।

সুবিমলকে অনেকদিন দেখেনি নন্দগোপাল। তাকে এদিকে দেখা যায় না, ড্রইংরুমের পর্দাটা একটু সরান থাকলে তবেই দেখা যায় ওই পৈশাচিক ঘরটা। ওখানেই তো যত কাণ্ড ঘটেছিল মিলা আর এই বুড়োকে কেন্দ্র করে। সুবিমল আজকাল হয়তো আর নিচে বেশী নামে না, ওর চাকর তো বুড়োর সঙ্গে একটা কথাও বলে না, হয়তো সুবিমল নিষেধ করে দিয়েছে, কথা বললে চাকরী যাবে। নন্দগোপালও সুবিমলের চাকরটাকে আর বেশী কথা বলে পিড়াপীড়ি করে না, বেচারার চাকরী গেলে খাবে কি! ওইতো সকাল থেকে রাত্রি প্রায় বারটা পর্যন্ত বাবুর হুকুম তামিল করেই যাচ্ছে। বাজার থেকে শুরু করে বাড়ীর রান্না পর্যন্ত তাকেই করতে হয়। এখানে

এক বালতি জল এনে দেওয়াও নিষেধ, প্রায় সাতমাস নন্দগোপালের স্নান হয়নি ; গায়ে কেমন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ছেড়েছে, খড়ি উঠছে সারা গায়। বেশ আছে লেখক নন্দগোপাল, এখনও পাগল হচ্ছে না কেন ? মাথাটায় তো আর কোনও বুদ্ধি বলে পদার্থ নেই। লেখাপড়া ভুলতে বসেছে সে ; আঘাতটা ভাগ্যি এই মাথায়ই লেগেছিল, তা না হলে এই মাথাটা আরও কতদিন ভাল থাকতো কে জানে ? আঘাত লাগার পর থেকেই তো কেমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয় এই মাথায়। ঘুম হয় না, কতকাল হয়ে গেল। আর ঘুমেরই বা অপরাধ কি ? রাত্রে তো আর কেউ পালঙ্কে মশারী টাঙ্গিয়ে করজোড়ে শুতে অনুরোধ করবে না, মশার কামড়ে তো সারাদেহে ঘা হয়ে গেছে। অন্ধকারই ভাল, মাছি এসে আবার জ্বালাতন করে না, মশাই যা একটু উপদ্রব করে। সে আর এমন কি, নন্দগোপাল আজকাল আর মশাকেও কামড়ানয় বাধা দেয় না ; খাক না, কত আছে যে খাবে। রক্ত তো বেশ কমে গেছে বোঝা যায়, হাতপাগুলো কেমন ফুলে ফুলে মোটা হয়েছে ; বুকের কাছটায় পাঁজরাগুলো স্পষ্ট গোণা যায়। তা যাবে না, আর যৌবন ফিরে পেতে চায় না সে। সুবিমলের এখন যৌবনের জোয়ার, সে সুখে থাক্। যৌবনকে ভোগ করতে হবে। নন্দগোপালের তো চির-কালটাই ত্যাগ করে কাটলো, আর এই বুড়ো বয়সে দেহের চিন্তা করে কি হবে। সবকিছুই এখন শেষ হলে বাঁচা যায়। আর চলে না।

হঠাৎ আজ আবার নন্দগোপালের মনে পড়েছে সেই অসতী শিখা মিত্রকে। শিখা অসতী নয়তো কি ? তার-ই জন্যে তো তার আজ এ অবস্থা, শিখা যদি তার ভালবাসার কোনও দাম দিতো তবে তো তাকে এ-নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না। বিজন তার জীবনের একটা অভিশাপ। বিজন যদি শিখার জীবনে না আসতো, নন্দগোপাল তো শিখাকে নিয়েই ঘর বাঁধতো, তারও সুবিমলের

মত ছেলে হতো! তার ছেলে নিশ্চয় ওই লম্পটের মত বাবাকে বন্দী করে তিলে তিলে মারতো না। না, না ভুল ভাবছে সে; শিখাকে অসতী ভাবাটা তার ঠিক হচ্ছে না, তবে তো মিলাও অসতী, কিন্তু নন্দগোপাল জানে মিলা কখনই অসতী নয়; হয়তো কারও চোখে সেও শিখার মত অসতী হতে পারে, কিন্তু না, মিলা যেমন সতী, শিখাও ঠিক তেমনি। জীবনের শেষ দিনগুলোয় আর মেয়েদের ছোট করে ভাববে না নন্দগোপাল। মেয়েরা কখনও ছোট হতে পারে না, এই পুরুষগুলোইতো তাদের ছোট করে। পুরুষরা লোভ দেখিয়ে তাদের সর্বস্ব লুটে নিয়ে পথে ঠেলে দেয়। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তো এই চোখের সামনেই রয়েছে। সুবিমলই তো মিলাকে রাস্তায় নামিয়ে দিলো, কি দোষ ছিল ওই সোনার মত মেয়েটার? কত করুণা ছিল তার মনে, হৃদয়ের তন্ত্রীগুলোয়! নন্দগোপাল তো তার প্রমাণ পেয়েছে। যাকে সে একটু একটু করে বড় করলো, সে করলো অনাচার; আর যাকে নন্দগোপাল কখনও দেখেনি, জানে না, সে করলো স্নেহ। এই তো পৃথিবী, একবার নন্দগোপালের এই পৃথিবীর উপর বিদ্বেষ জন্মে; আবার মিলার মত মেয়েদের কথা মনে পড়লে সে বিদ্বেষ কোথায় উবে যায়।

শিখা কি সুবিমলের বইগুলো পড়েছে! নন্দগোপালের বই নয়, এখন ওগুলো সুবিমলের লেখা, নন্দগোপালের কাহিনী। সুবিমলের লেখা ও বইগুলো কি সে পড়েছে, হয়তো পড়েছে, পড়ে কি ভাবছে কে জানে? হয়তো আজও বাতায়নটার পাশে বসে ভাবছে, কে এই সুবিমল রায়, তার জীবনের চরম ক্ষণগুলো সে জানলো কেমন করে! হয়তো নন্দগোপাল বলে কোনও লোক তাকে বলেছে, সে লিখেছে। এমনও তো হয়। কতজনের কাহিনী কতজন লেখে, কতজনের লেখার মধ্যে কতজনের কাহিনী কত সুন্দরভাবে ফুটে উঠে। শিখারও বয়স হয়েছে বেশ, তারও তো ছেলেমেয়ে আছে, শুধু একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে নন্দগোপাল রায়। একেবারে নিঃস্ব। এমন করে বোধ

হয় কেউ কখনও একেবারে জীবনের সমস্ত রসগন্ধ উজাড় করে ফেলে দিয়ে ভিখারী হয়ে যায়নি। হয়তো গেছে, নন্দগোপাল আর ক'জনের ইতিহাস জানে। তার চোখে পড়েনি এই যা। শিখার কথা মনে পড়ে আজ আবার অনেকদিন পরে,—বৃদ্ধের চোখের কোণে জল দেখা গেল, শতছিন্ন কাপড়টা দিয়ে আর চোখ মুছতে ইচ্ছে করলো না তার ; জলটা নেমে আসছে, আসুক। নন্দগোপাল চুপ করে বসে রইল, যেমনটি ছিল ঠিক তেমনিভাবে।

ক্যালেণ্ডারে এ মাসের পাতাটাও শেষ হতে চলেছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, ছটা ঋতুই একে একে আসবে, আবার যাবে। কিন্তু নন্দগোপালের জীবনের আর কোনও পরিবর্ত্তন যে হবে না ; তা বেশ বোঝা যায়। জেলখানার কয়েদীরাও নন্দগোপালের চেয়ে ভাল আছে ; তারা তবু একটু চলে ফিরে বেড়াতে পায়। জেলের কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। নন্দগোপাল শুনেছে তাদের খোয়াও ভাঙ্গতে হয়। নন্দগোপালকে যদি কেউ শুধু খোয়া ভাঙ্গতেও দিতো, নন্দগোপাল তাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতো, কিন্তু কে নন্দগোপালকে মুক্তির পথ দেখাবে ? নোংরা দুর্গন্ধময় অন্ধকার থেকে মুক্ত আকাশের তলায় কে নিয়ে গিয়ে একবার দাঁড় করিয়ে বৃদ্ধ-লেখককে বলবে, একটু প্রকৃতিকে দেখে নাও। শেষ দেখা।

কতবার নন্দগোপাল এই জীবনের শেষ কামনা করে দরজায় মাথা কুটেছে, কতবার ওই মরচে ধরা ক্ষতটায় মরচে ঝরে গিয়ে সারা মুখমাথা রক্তাক্ত হয়েছে; বেদনায় চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে নন্দগোপাল, তবু কেউ মুক্তি দেয়নি, একটু সোহাগ করে বলেনি ; জ্যাঠাবাবু খুব কষ্ট হচ্ছে ? যন্ত্রণায় কতবার অচেতন হয়ে পড়েছে সে, চাকর ভাত দিয়ে গিয়েছে খায়নি কতদিন, তবু কেউ একটু প্রকৃতির আলোক দেখিয়ে নিয়ে আসেনি ; বলেনি, চল একটু সময়ের জন্যে তোমায় মুক্তি দিচ্ছি,—ওই বাগানটায় একটু বসো। বলেনি, কেউ বলেনি নন্দগোপালকে একটাও আশার কথা !

শিখা কি বেঁচে নেই, মিলা কি মরে গেছে? একবারওতো খোঁজ নিয়ে জানতে পারতো বুড়ো লেখকটার কোনও সংবাদ নেই কেন? মরে গেছে না এখনও বেঁচে আছে?

কাপড়টা এতো ছিঁড়ে গেছে, যে এ পরে-তো আর বাইরে যাওয়া হবে না, মুক্তি পেলেও কোনওদিন আর বাইরে যাওয়া চলবে না। অসম্ভব, মানুষের সামনে আর কি নিয়ে দাঁড়াবে সে, তার চেয়ে এখানেই শেষ হয়ে যাক তার জীবনের সবটুকু। সবটুকু আর কাথায়? যেটুকু বাকী আছে শুধু সেইটুকু।

চাকরটা ভাত দিয়ে গেল, মেনুতে সুবিমল শুধু ভাত পাশ করেছে। সেই শুধু ভাতই চাকরটা দিয়ে গেল ছোট্ট একটা কলায়ের গামলায় করে। চাকরটা ডালের সঙ্গে একটু নুন এনেছে। এ্যালুমেনিয়মের গ্লাসটায় একটু ঠাণ্ডা জল।

আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আবার বড় তালাটা ঝুলতে শুরু করেছে। নন্দগোপাল সবটুকু জল শেষ করে ফেলল। আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই। ভাতগুলো আর খেতে ইচ্ছে করছে না তার। ওগুলো পড়ে রইলো, যেমন ভাবে এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই। ওগুলো একবার ছুঁয়েও দেখলো না সে।

সুবিমল কেন যে খানিকটা বিষ পাঠিয়ে দেয় না, তাই ভাবছে আজ নন্দগোপাল রায়।

এতটুকু উপকার করবে কেন সে? নন্দগোপাল যে মানুষ করেছে তাকে, একটু একটু করে বড় করেছে, লেখাপড়া শিখিয়ে মগজে বুদ্ধি ধরিয়েছে, তাইতো এতটুকু উপকার করা তার কুষ্ঠিতে লেখেনি।

বার

অনেকদিন হ'ল মিলার বিয়ে হয়ে গেছে সরল এক অধ্যাপকের সঙ্গে। মিলার খবর এখন আর কেউ রাখে না, কোথায় বিয়ে হয়েছে কেউ জানে না, বিবাহ-বাসরে নিমন্ত্রিত অতিথি কেউ আসেনি, সানায়ের করুণ রাগিণী অনেক দূর থেকে শোনা যায় নি।

মিলা সকলের কাছে কত পরিচিত ছিল, সবাই ভালবাসতো মিলাকে তার সামাজিক কাজ আর ভদ্র ব্যবহারের জন্যে। মিলা ছিল যেন এ পল্লীর প্রাণ, অথচ সেই মিলার জীবনের যখন চরম লগ্ন এলো, কেউ জানলো না, মিলার বাবা কাউকে জানিয়ে এলেন না, নিমন্ত্রিত হল না কেউই।

অনেকেই ভাবে কেন এমন হল ? কারণ সংগ্রহে কেউই কিন্তু বেশী মাথা ঘামালো না ; মিলার বিয়ে হয়ে গেল। যেন মিলার বাবা-মা মিলাকে শেষ বিদায় দিলেন অল্প একটু শাঁখ বাজিয়ে, যেন মড়ি-পোড়া বামুনকে দিয়ে একটু বিদায়ের মন্ত্র পড়িয়ে। মিলাও তার বাবা-মার কাছ থেকে বিদায় নিলো, এর জন্যে এতটুকু অনু-শোচনা বা অভিযোগ করলে না সে। বরং কৃতার্থ হয়ে গেল বাবা-মার এই অসীম দয়া দেখে।

বিদায়ের দিন মিলার মুখটা খুব ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সাদা কাগজের মত : যেন প্রাণ নেই মিলার, শুধু দেহটা। দেহটা কোনওক্রমে নিয়ে মোটরে গিয়ে উঠেছিল ; সত্যিই মিলার প্রাণ ছিল না, প্রাণ-হীন দেহটা প্রফেসর সঙ্গে নিয়ে গেল।

তারপর।

তারপর কি হয়েছিল কেউ জানে না, মিলার আর কোনও সংবাদ রাখা কেউ প্রয়োজন মনে করেনি। মিলা হয়তো অভিনয় করে সারা জীবনটা কাটিয়ে দেবে ; নয়তো অধ্যাপক মিলাকে ক্ষমা

করে বুকে তুলে নেবে। মিলার দুঃখ দেখে হয়তো সে তার নিজের দুঃখ ভুলে যাবে; মিলাকে সমাজে আশ্রয় দিয়ে হয়তো মিলাকে ধন্য করবে! মিলাও প্রফেসারের কাছে শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়বে; মনে মনে বলবে,—মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক; মানুষই দেবতা, মানুষই দানব। এই পৃথিবীতে যেমন দেবতাও আছে, পৈশাচিক মনবৃত্তি-ওয়ালা দানবেরও অভাব নেই।

মিলার এই শ্মশানযাত্রা সারা পল্লীটায় একটা বিষাদের ছায়া মেলে দিয়েছিল; মিলা চলে যাওয়ার পর সকলেই মিলার চলে যাওয়ার কথায় অনুতাপ করেছিল।

এখন সব শেষ হয়ে গেছে, মিলাকে ভুলে গেছে অনেকেই। মিলারা সে বাড়ী ছেড়ে দিয়েছে; মিলার বাবা-মা কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না। বাড়ীটা এখনও খালি পড়ে আছে, বিরাট একটা তালা ঝুলছে বাড়ীটার বাইরের দরজায়, ঠিক যেমনভাবে আর একটা তালা ঝুলছে শিল্পসংগঠনীর দরজায়। শিল্পসংগঠনীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে মিলার অভাবে। যে ক-জন বিধবা মেয়ে শিল্প-সংগঠনীতে নাম লিখিয়েছিল, মিলা চলে যাওয়ার পর তারাও বিদায় নিয়েছিল, আর আসেনি। মিলাকে তারাও ভালবেসেছিল, মন দেওয়া-নেওয়ার একজনকে পেয়েছিল তাদের মধ্যে; মিলা চলে যাওয়ায়, তারাও এখানে আসার আর কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করেনি। সংগঠনীকে দেখার আর কেউ ছিল না। দরজায় তালা দিয়েছিল সভ্যাদের মধ্যে একজন। সে কিছুদিন অপেক্ষা করেছিল, প্রতীক্ষা করেছিল কারও আগমন প্রতীক্ষায়, কিন্তু তার সে প্রতীক্ষা করা বৃথা হয়েছিল। কেউ আসেনি আর, কেউ ভাবলো না এর কোনও প্রয়োজনীয়তার কথা। এখন সেলাই মেসিনগুলোয় মরচে ধরতে শুরু করেছে। অন্দরের অসংখ্য কাপড়ের টুক্‌রোতে পোকা ধরেছে; ছোট টেবিল আর চেয়ার দুটোয় উই ধরেছে বেশ কিছুদিন হল; কেউ এসে একবার তালা খুলে ভেতরের অবস্থাটা

দেখাও দরকার মনে করে না ; এমন ভাল একটা প্রচেষ্টা একেবারে শেষ হয়ে গেল, শুধু একটা মেয়ের অভাবে।

পাশের লাইব্রেরীটায় পাড়ার কয়েকটা যুবক একসঙ্গে বসে একদিন মাত্র আলোচনা করেছিল এই সংগঠনীটাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তাও ফলবতী হয়নি ; লাইব্রেরীই চলে না, তার উপর আবার মেয়েদের একটা সংগঠন, মেয়েরাই যখন চালাতে পারলো না, তখন ছেলেরা কি করতে পারে। কে আবার বোঝাবে মেয়েদের, যে এতে তাদের খুব উপকার হবে। নিজের ভাল নিজেরা যদি না বোঝে, কেউ কি তা বুঝিয়ে দিতে পারে? শিল্পসংগঠনীর দরজা খোলার আর কোনও প্রচেষ্টা হয়েছিল বলে আর কারও মনে পড়ে না। সংগঠনীর কিছু জিনিস আজও ওখানে পড়ে আছে বলে, পাড়ার ছেলেরা ওটা খোলেনি, তাসখেলার সুন্দর একটা জায়গা এমনভাবে আটকা পড়ে আছে বলে অনেকেরই হা-হুতাস শোনা যেতে লাগলো মাঝে মাঝে।

মেসিনগুলো বিক্রি করে লাইব্রেরীতে বই কেনার প্রস্তাব নিয়ে পরামর্শের জন্যে পাড়ার কয়েকজন একবার সুবিমলের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু সে প্রস্তাবে সুবিমল ঠিক রায় দিতে পারেনি ; বলেছিল,—থাকনা ওগুলো, যদি কেউ আবার এগিয়ে আসে তখন ওটা চালাবার ব্যবস্থা করা যাবে। সুবিমল এই সংগঠনীকে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না, ওকে কেন্দ্র করেই তার জীবনের একটা চরম অধ্যায় শুরু হয়েছিল, তাই স্মৃতির চিহ্ন স্বরূপ ওটাকে সে ওই ভাবে তালা বন্ধ রাখার-ই পক্ষপাতী ছিল।

এই সংগঠনীটার পাশ দিয়ে যখনই সুবিমল রায় যায়, তখনই মিলাকে তার মনে পড়ে, মনে পড়ে তার শেষ দিনের সেই সকরুণ মুখচ্ছবি। এক একবার মনে হয় সুবিমল এ জীবনে যা অন্যায় করেছে, তার ক্ষমা নেই ; ফুলের মত সুন্দর একটা জীবনকে সে যেভাবে বিষিয়ে তুলেছে, যেভাবে তার সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করে

দিয়েছে, তার তুলনা হয় না। মিলার কথা মনে পড়লেই বৃদ্ধ জ্যাঠার কথা মনে পড়ে যায়। বুড়োকে কতদিন দেখেনি সে, শুধু মাঝে মাঝে গোঁঙানীর শব্দ শুনতে পায় দোতালার বারান্দা থেকে। নন্দগোপালকে বন্দী না করে সুবিমলের উপায় ছিলনা। বাঁচার তাগিদে ওটা তাকে করতেই হয়েছে। এর জন্যে খুব দুঃখিত সে নয়। কিন্তু মিলা! ওকে তো বিয়ে করে সুবিমল জীবনটাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারতো। মিলা কোনও অংশে তার অযোগ্য ছিল না। শিক্ষিতা, আধুনিকা, বিনীতা, সুন্দরী, সবগুণই ছিল মিলার মধ্যে, অন্যায় করেছে সুবিমল। শুধু অন্যায় নয়, একটা ভুলও করেছে সে, এর সংশোধনের আর কোনও উপায় নেই তার কাছে।

বহুদিন পরে সুজন ফিরে এসেছে এই কর্ম-চঞ্চল কলকাতায়। অনেক আগ্রহভরে প্রথমেই গেল মিলাদের বাড়ী। দরজা বন্ধ, মস্ত একটা তালা ঝুলছে দেখে সে প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কতকথা, কত চিন্তা একসঙ্গে তার মনে দোলা দিয়ে গেল। মিলারা কি সুবিমলের বাড়ী উঠে গেছে। সুবিমল হয়তো বিয়ে করেছে মিলাকে ; সেটাই স্বাভাবিক। আবার চলে যাবে সে কলকাতা ছেড়ে, এখানে সে কি নিয়ে বাঁচবে ? ভেবেছিল মিলা ছুটে এসে বলবে,—এতদিন কোথায় ছিলে সুজন ? আমার উপর অভিমান করে কোথায় চলে গিয়েছিলে তুমি ? তুমি যেদিন চলে যাও তোমার সাধের সংগঠনীকে ফেলে, সেদিনই আমি বুঝেছিলুম, তোমার ব্যথাটা কোথায় ? আর যাইনা সুবিমলের বাড়ী। তোমার প্রতীক্ষায় আজও বসে আছি ; দেখছনা ভেবে ভেবে কত রোগা হয়ে গেছি। বাবাঃ কি অভিমান, এত অভিমান মেয়েদেরই শোভা পায়, তোমার মত পুরুষের ওগুলো মানায় না। চল, দেখবে চল, তোমার সংগঠনীকে আজও কেমন বাঁচিয়ে রেখেছি। শুধু বাঁচিয়ে রেখেছি নয়, কত বড় করেছি। তুমি এসেছ এবার আমার দায়িত্ব

অনেক কমে গেল। আমাদের কষ্ট দিতে তোমাদের খুব ভাল লাগে, না ?

কিন্তু মিলা এলো না। কলকাতাকে বিদায় দেওয়ার আগে একবার শিল্পসংগঠনীকে না দেখার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারলো না সুজন। ছুটে গেল লাইব্রেরীর ধারে, গিয়ে দেখল, শিল্পসংগঠনীর দরজা বন্ধ ; পাড়ার একটা ছেলে সুজনকে দেখে অবাক হয়ে গেল। ছুটে এসে বলল,—সংগঠনী অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, আপনি চলে যাওয়ার পর এ সংগঠন অবহেলায় কোনও রকমে চলছিল, তারপর মিলাদেবীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর, ওঁরা এ পাড়া ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন কেউ জানলো না। মিলাদেবীর যে হঠাৎ বিয়ে হয়ে যাবে, তা তো আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি। একদিন হঠাৎ শুনলাম গতকাল মিলাদেবীর বিয়ে হয়ে গেছে। এক প্রফেসরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এইটুকুই শুনেছি ; কোথায় বিয়ে হয়েছে, কেউই জানে না। আমরা তো সেলাই মেসিনগুলো বিক্রি করে লাই-ব্রেরীর বই কিনবো ঠিক করেছিলুম, সুবিমলবাবুই শুধু বাধা দিলেন। বললেন—কেউ যদি ওটার ভার নেয়, তখন আবার কি করে চালান যায় ভাবা যাবে, আপাততঃ ওইভাবেই থাক। তারপর থেকে ও ঘরটা ওইভাবেই পড়ে আছে। যাক আপনি এসে পড়েছেন, এবার আবার ওটা চলতে শুরু করবে। সুবিমলবাবু ঠিকই বলেছিলেন।

সুজন জিজ্ঞাসা করলে,—সুবিমলবাবু কি এখনও এখানেই আছেন ?

হ্যাঁ, আছেন ! গেলেই দেখা হবে।

সুজন মনে মনে সুবিমলকে অভিনন্দন জানাল, সে তবু মেসিন-গুলো বিক্রি হতে দেয়নি ; মেসিনগুলো বিক্রি হলেই তো সংগঠনীর শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যেত। সুজন ভাবলো, সুবিমল নিশ্চয় মিলার খবর রাখে। সে একটা হদিস দিতে পারবে, হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল কেন তাও জানতে পারবে সুজন। সুবিমলবাবুর মিলার খবরটা

দেওয়ায় হয়তো কোনও আপত্তি থাকবে না। আপত্তির কারণই বা কি থাকতে পারে? আচ্ছা সুবিমল মিলাকে বিয়ে করলো, না কেন! মিলা কি আপত্তি করেছিল; না অন্য কোনও কারণে মিলার মনে বিদ্বেষ জন্মেছিল! কিংবা অন্য কারণ থাকতে পারে? একজন অধ্যাপকের চেয়ে সুবিমল নিশ্চয়ই যোগ্যপাত্র। সুজন না হয় এদের চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু সুবিমল! সুবিমল তো রূপে, গুণে, অর্থে, মিলার চেয়ে কোনও অংশে ছোট নয়; মিলা আপত্তি করলো কেন?

নানা প্রশ্ন সুজনের মনে ভীড় করে দাঁড়াল। কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কল্পনা আপাততঃ ত্যাগ করলো সে। মনে মনে বরং আপশোষ করলো এতদিন কলকাতার বাইরে কাটানর জন্যে। মিলার একটা খবরও তো সুজন নিতে পারতো। অবশ্য এর জন্যে সুজন নিজেকে খুব বেশী দোষী করলো না। মিলার যে অবস্থা সে দেখেছে, যে কোনও প্রেমিকার এই অবস্থা দেখলে বা শুনলে প্রেমিকের মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠা স্বাভাবিক। সুজন অন্যায় কিছু করেনি। সে চলে গিয়ে মিলার পথ বরং পরিষ্কার করে দিয়েছিল। মিলা তো সুবিমলকে গ্রহণ করতে পারতো। কেন সে গ্রহণ করলো না? মেয়েদের মন বোঝার মত বুদ্ধি সত্যি তার আজও হয়নি। কোনও দিন হবে বলে তো মনে হচ্ছে না, বয়স ত্রিশ পার হয়ে গেল, এখনও মেয়েদের সে চিনতে পারে না। গোয়ালার যেমন আশী বছরে বুদ্ধি হয়, তারও বোধহয় সেই আশী বছর না হলে বুদ্ধি খুলবে না। আশী বছর না হলে মেয়েদের সে চিনতে পারবে বলে তো মনে হচ্ছে না। অতদিন বেঁচে থাকবে কিনা কে জানে? আর মেয়েদের বোঝার জন্যে অতদিন তার বেঁচে না থাকলেও চলবে।

সুজন চলতে শুরু করেছে। সুবিমলের বাড়ী খুব বেশী দূর নয়, কতক্ষণই বা লাগবে! ভাবনাগুলো আবার জড়ো হচ্ছে মাথার মধ্যে। সে চলে যাওয়ার পর সব যেন ওলোট পালট হয়ে গেল,

কিছুই সে ভেবে উঠতে পারছে না। বারবার মিলার কথা মনে হচ্ছে ; মেয়েটা সত্যিই অদ্ভুত, বলে এক, আর করে আর এক ; প্রথম প্রথম তো কত ভাল ভাল কথা বলেছিল, বিয়ে করে ঘর-সংসার করা তার তো পোষাবে না ; ওতো একেবারে সাধারণ মেয়েদের জন্যে। আর আজ মিলা কোথায় ? সুবিমলের প্রেমে পড়লো, তার জন্যে সুজনকে কলকাতার বাইরে চলে গিয়ে হা-হুতাস করে এতগুলো দিন কাটিয়ে দিতে হল। এদিকে মিলা শুড়্ শুড়্ করে ভাল নিরীহ মেয়েটির মত একলা ঘোমটা দিয়ে এক প্রফেসরের সঙ্গে ঘর করতে চলে গেল। মেয়েদের মনটা বড় চঞ্চল, একটা কিছু ধৈর্য্য ধরে করার ক্ষমতা তাদের নেই। ভালবাসতেও তারা জানে না। যখন যা মনে হয়, তাই করে বসে। এতে যে আরও একজনের জীবনের অনেক কিছুই জড়িয়ে আছে, সে চিন্তা করাও দরকার মনে করে না। নিজেরটা নিয়েই এরা ব্যস্ত। সুবিমলতো মিলাকে ভালবেসেছিল, হয়তো তার নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসে ঐ লেখক সুবিমল রায়। মিলা তার কথাও একবার ভাবলো না। সুবিমলের দিনগুলো কেমন করে কাটছে কে জানে! হয়তো মনের ক্ষতটা বাইরের প্রলেপে কোনও রকমে ঢেকে রেখে সে কাজ করে যায়। সুবিমলের জন্যে দুঃখ হল সুজনের।

সুজন সুবিমলের বাড়ীর সেই পৈশাচিক ড্রইংরুমে এসে উপস্থিত হল!

তের

সুবিমলের ড্রইংরুমটায় কেমন যেন একটা গুমটভাব বর্তমান রয়েছে। মিলার সঙ্গে সুজন যখন এখানে দু-একবার এসেছিল, তখন যেন এ ঘরের মধ্যে একটা প্রাণের ছোঁয়া পেয়েছিল সে।

পুরোন চাকরটা আজও আছে, তবু তারও যেন কেমন একটা

পরিবর্তন হয়েছে। সুজনকে সে যেন চিনতে পেরেও পারছে না। খানিকটা বুড়োটে-মেরে গেছে সে। সুজনকে বসতে'বলে চাকরটা সুবিমলকে ডাকতে ভেতরে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে এসে সুজনকে জানাল, বাবু আসছেন,আপনি একটু বসুন। সুজন বসেই রইল ; সুবিমলের আসতে বেশ দেরী হচ্ছে। সুজন একবার সারা ঘরটায় ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিল দেখলো পিয়ানোটায় ধুলো জমেছে, নটরাজের মুর্তিটা আজও তেমনি বসান রয়েছে, সেটাও পরিষ্কার করা হয়নি। বড় ক্যালেণ্ডারটা আজও ঝুলছে বটে, তবে তিন মাসের পুরোন পাতাটা আজও সামনে রয়েছে, কেউ পালটে রাখেনি। বড় জানালাটার ফাঁক থেকে দেখলো সুবিমলের সাজান বাগানটা কেমন শুকিয়ে গেছে ; ফুলগাছের পুরোন ডালগুলো আজ বিক্ষিপ্ত ভাবে নুয়ে পড়েছে, বাগানের যত্ন আর কেউ করে না। সারা বাড়ীটায় কেমন একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছে ; ছন্নছাড়া সৃষ্টিছাডা ভাবটা বাড়ীর সবখানেই ছড়ান।

একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সুবিমল পর্দাটা সরিয়ে ঘরে ঢুকে নমস্কার করলো সুজনকে। সুজন জিজ্ঞাসা করলো কেমন আছেন ?

—ভালই, কিন্তু আপনি ?

—কেন, চিনতে পারছেন না ?

—কই নাতো !

—সেকি, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন ?

—কোথায় আপনাকে দেখেছি বলুনতো ?

—এখানেই !

—আশ্চর্য, স্মরণ হচ্ছে না তো !

—সেই মিলাদেবীর সঙ্গে এসেছিলাম বেশ কয়েকবার !

—মিলা দেবী ?

—কেন মিলাকেও চিনতে পারছেন না ?

—নাতো !

—সে কি !

—হ্যাঁ, মিলাদেবী কে বলুন তো ?

—সেই আমাদের মিলা !

—মাফ্ করবেন, চিনতে পারছি না।

—মিলাকেও ভুলে গেছেন !

—কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না !

সুজন এবার বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল, বেশ কিছুক্ষণ তার কথা বলার মত শক্তি রইল না। ভাবলো, সুবিমল সত্যিই কি আমাদের ভুলে গেল, না, ভুলে যাওয়ার ভাণ করছে। তাকে সুবিমল হয়তো ভুলে যেতে পারে ; কিন্তু মিলা ? মিলাকে না চিনতে পারার পেছনে কোনও যুক্তি আছে কি ? নিশ্চয় নেই ; সুবিমল মিলাকে ভুলতে পারে না, অসম্ভব ! এত তাড়াতাড়ি একটা মেয়েকে ভোলা এতো সহজ নয় ; একটা কুকুর বেড়াল বাড়ীতে পুষলে তাদেরই ভুলতে দেরী হয়, আর একটা মানুষ, বিশেষ করে মিলার মত। যাকে নিয়ে সুবিমল দিনের পর দিন স্ফূর্তি করে কাটিয়েছে, মিলার সঙ্গে একটা সন্ধ্যে না কাটালে সুবিমলের ঘুম হতো না, আর মাত্র এই ক'টা দিনে সুবিমল মিলাকে একেবারে ভুলে গেল ? এ-কথা সে কেমন করে বিশ্বাস করবে ! হয়তো সুবিমল মিলাকে আর চিনতে চায় না। এটা হয়তো হতে পারে মিলা সুবিমলকে এমন একটা আঘাত দিয়েছে, যে আঘাতে সুবিমলের মনটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। ও নামটা আর হয়তো সে সহ্য করতে পারে না। তা না হলে মিলাকে না চেনার ভান করার আর কি কারণ থাকতে পারে।

সুজন কিছুতেই কোনও কারণ খুঁজে বের করতে পারলো না, বারবার নানা কথা চিন্তা করে এর একটা কিনারা বের করতে চেষ্টা করলো, পারলো না। এবার আবার জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা শিল্পসংগনীকে আপনার মনে পড়ে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার বুঝেছি, আপনি কার কথা বলছেন ?

—মনে পড়েছে ?

হ্যাঁ, যে মেয়েটি আমার কাছে মাঝে মাঝে আপনাদের শিল্প-সংগঠনীর সাহায্য চাইতে আসতো ; তারই নামতো মিলা, না ?

—আমি সেই মিলার কথাই বলছি !

—আর আপনিই তো সুজনবাবু, না ?

—হ্যাঁ, আমিই সুজন।

—কি করতে পারি বলুন ?

—আমি বহুদিন কলকাতার বাইরে ছিলুম।

—তাই অনেকদিন আপনাকে দেখিনি।

—ফিরে এসে মিলার কোনও খবর পাচ্ছি না। আপনি নিশ্চয়ই তার সংবাদ রাখেন ?

—না মশাই, মিলা কেন কারুরই সংবাদ আমি রাখি না, আর রাখাও সম্ভব নয়। আমার অত লোকের খবর রাখার মত সময় নেই, লেখা তো আছেই, তারপর রোজই সভা-সমিতি; এখন কারও কোনও খবর রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। মাফ করবেন, মিলার কোনও সংবাদ আপনি আমার কাছে আশা করবেন না।

—সে কী ?

—হ্যাঁ, এটাই সত্যি !

সুজন আবার স্তব্ধ হয়ে গেল ; এরপর আর কি জিজ্ঞাসা করবে সে সুবিমলকে। হায়রে! একদিন যাকে না হলে সুবিমলের এক মুহূর্ত চলতো না, আর আজ তার একটা খবর নেওয়া সুবিমল প্রয়োজন বোধ করে না। কেমন যেন সব পালটে গেছে এই ক'টা দিনে ; সুজন না এলে বিশ্বাস করতে পারতো না, আর না জেনে কি এ-কথা বিশ্বাস করা সম্ভব। বাইরে থেকে যদি কেউ সুজনকে সুবিমলের এরূপটা বর্ণনা করে চিঠি লিখতো, কিংবা

জানাতো সুজন তো প্রথমেই হেসে উড়িয়ে দিতো, বিশ্বাস করতো না, এর একটা কণাও। সুবিমল আজ কত পালটে গেছে, চেহারাতে রুক্ষ একটা ভাব ফুটে উঠেছে। ব্যবহারেও খানিকটা। কথাগুলো কেমন যেন কাটা কাটা, কোনও রকমে বলে শেষ করে সুজনকে যেন বিদায় দিতে পারলেই সুবিমল নিষ্কৃতি পায়।

সুজন বললো,—আচ্ছা, আজ তবে আসি।

—আসুন।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

সুবিমল বিদায় দিল সুজনকে, সুজনও বিদায় নিয়ে এই গুমোট ড্রইংরুমটা থেকে বেরিয়ে যেন বেশ একটু নিজেকে মুক্ত বলে মনে করলো। সুবিমল ঘরটায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা যেন আরও শ্রীহীন হয়ে পড়লো, আরও খানিকটা কাঠিন্য এসে জোড়া লাগলো, বেশীক্ষণ বসে থাকতে সুজনের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। বারবার সেই পুরোন সুবিমলের সঙ্গে এই নতুন সুবিমলের পার্থক্যটা কোথায়, সুজন সেই পুরোন সুবিমলের মূর্তিটা কল্পনা করে যাচাই করে দেখবার চেষ্টা করছিল। পার্থক্যটা বড় বেশী করে ধরা দিল নতুন সুবিমলের ব্যবহারে। ভদ্রতার যেন লেশমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। আন্তরিকতা একেবারে উবে গেছে, কথাগুলোর জবাব আর বাহ্যিক সৌজন্যটুকু কোনওরকমে বজায় রেখেছে সে। সেটুকুও বাদ দিলে সুবিমল বেশী আনন্দিত হতো। কিন্তু মানুষের সমাজে বাস করে, ওটুকু না রাখলে চলে না বলেই আজও সুবিমল ওটুকু বজায় রেখেছে।

সুজন সুবিমলের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হল। সে অন্ততঃ মিলার একটা সংবাদ আশা করেছিল সুবিমলের কাছে; কিন্তু সে আশার জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে এখন। সুবিমল তাকে কিছুই জানালো না। কেন? এই প্রশ্নটা এবার সুজনকে পেয়ে বসেছে। তার

মাথায় হাজার চিন্তা ঘুরে বেড়াতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই কিনারা করতে পারলো না সুজন। সুবিমলের এই বাহ্যিক পরিবর্তনের কি কারণ থাকতে পারে; তা সুজনের এই ক্ষুদ্র মাথায় ঠাঁই পেল না। সে বারবার ভাবলো, এর মধ্যে এমন একটা রহস্য ঢাকা পড়ে আছে, যা একান্ত গোপনীয়, এ গোপনীয়তা সুবিমল প্রকাশ করতে একেবারেই নারাজ। এভাবে সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞাসা করে সে সুবিমলের কাছ থেকে কিছু বের করতে পারবে বলে মনে করলো না। অন্য একটা পথ তাকে খুঁজে বের করতেই হবে; যে পথে সে সুবিমলের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু সুজনের সামনে তো কোনও পথই খোলা নেই; সমস্ত রাস্তাই তো বন্ধ; কোন্ পথে যাবে সে? কোন্ রাস্তায় চললে আসল রহস্যের সন্ধান সে পেতে পারে? এই চিন্তাই তার সারা মনটা আচ্ছন্ন করে রাখলো। সুজন চিন্তা করেই চলেছে; একটা রাস্তাও সে করে উঠতে পারছে না। একটা পথও তার সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে না।

দিগ্‌ভ্রান্ত সুজন পথকেই পাথেয় করে নিল, তার-চলা শুরু হল এই পথকেই আশ্রয় করে। সুজন হল এই পথেরই যাত্রী। অনাদিকাল হ'তে আজ পর্যন্ত কত পথিক পথ চলেছে, তার জীবনের শুরু সূর্যোদয়ে, শেষ সূর্যাস্তে; শুরু পূর্বরাগের সঙ্গে ভৈরবীর সুর তুলে, শেষ তিমির-রাত্রে ভাবসম্মেলনে বেহাগের বুক ফাটানো বাঁশীর সুরে। সুজনের যাত্রা এই শেষ থেকে, তিমির রাত্রে বুক ফাটানো বেহাগের মূর্চ্ছনায় তার চলা শুরু হয়েছে: এ চলার শেষ কোথায় সুজন জানে না, তবু শেষ আছে। রাত্রির পর সূর্য উঠবে, নতুন আলোর মালায় পূবআকাশ রাঙিয়ে; তখন কি সুজনের যাত্রা হবে শেষ? জীবনের শেষ সূর্যাস্তে, জীবনের পরিসমাপ্তি অন্ধকারে; কিন্তু এই সূর্যাস্ত আর অন্ধকারের পরেই তো আলোর মূর্চ্ছনা। এই আলোর মাঝেই তো সুজনকে জয় করে নিতে হবে অমরত্বের জয়টীকা। সার্থক যাত্রিকের যাত্রা শেষ তো এই আলোর লীলা-

নিকেতনে। এতো আর জীবনের শেষ যাত্রা নয়, পথের শুরু। ভবিষ্যৎ জীবনের নবজন্মের ভাবী স্বপ্নে বিভোর সুজন মিলার সন্ধানে পথকে সাথী করে নিলো। এই পথেই তো,—'আনন্দম্ অমৃতম্'; অমৃতম্ আনন্দম্।

চোদ্দ

সুবিমলের জন্মদিবস পালিত হবে, সুবিমলের বাড়ীর লনে। লাইব্রেরীর তরুণরা সুবিমলের সম্বর্ধনার আয়োজন শুরু করেছে। সুবিমলের ফুলের বাগানে নামকরা ডেকরেটর বিরাট মঞ্চ আর সুন্দর ডেকরেটিংএর ব্যবস্থা করে চলেছে। লাইব্রেরীর যুবকের দল বারবার সুবিমলের বাড়ী আনাগোনা শুরু করেছে।

সুবিমলের নতুন উপন্যাস সে বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছে। বাংলার অনেকস্থানেই সুবিমলের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছে। সে কয়েক জায়গায় সম্মানিত হয়েছে। রাত জেগে জেগে সুবিমলকে বাধ্য হয়েই বক্তৃতা লিখে রাখতে হয়। একজন তরুণ সাহিত্যিককে দিয়েও সুবিমল বক্তৃতা লিখিয়ে নিচ্ছে। তার পারি-শ্রমিকের জন্যে সুবিমলের কিছু কিছু অর্থ ব্যয় হচ্ছে।

নতুন উপন্যাসখানা আসানসোলের কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবনীকে কেন্দ্র করে। তারা কেমন করে দিনের পর দিন মাটির নিচে অন্ধকারে কাজ করে চলেছে তার এক সকরুণ ইতিহাস। নিঃস্ব এই আদিবাসীদের সুখ-দুঃখের এমন বর্ণনা আজ পর্যন্ত কোনও বাঙ্গালী লেখক এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেনি; কোল-মাইনের ম্যানেজারের অত্যাচারের কাহিনী ভালভাবে আর কোনও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে আর কারও জানা নেই। খাদের পাশে ছোট ছোট চালাঘরে কেমন করে তাদের দৈনন্দিন জীবন কেটে যায়, কেমন করে তারা স্ত্রী-পুরুষের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে খাদে

কাজ করে চলে ; কেমন করে পে-ক্লার্ক ম্যানেজারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাদের এই সুকঠিন পরিশ্রমের টাকায় ভাগ বসায় তারই ইতিহাস লেখা আছে এই নতুন উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

একবার বড় একটা খাদে যখন ধস্ নামে, কত জীবন যে কিভাবে সমাহিত হয় আর কেমন করে তারা অর্থাৎ এই খাদের কুলিরা প্রবঞ্চিত হয়—খাদের মালিকের কাছ থেকে ; তারই বিবরণ লেখা আছে এতে। খাদের মধ্যে দিনের আলোয় যারা সূর্য দেখতে পায় না, তাদের দুঃখের জীবন-ইতিহাস এমন করে আর কেউ লিখে রাখেনি, এমন করে কেউ সন্ধান করেনি এই অবহেলিত বাংলার আদিবাসীদের।

পূর্ণিমার রাত্রে তাদের মাদলের সুর যখন মহুয়া বনে ভেসে বেড়ায়, মহুয়ার মাদকতায় তখন তাদের জীবনের যে ইঙ্গিত, নবজীবনের যে প্রেরণা এই উপন্যাসে লেখা আছে, তা যে কোনও পাঠকের মন টেনে নিয়ে যায় এই কুলিদের মনের মাঝে। তাদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয় লেখক এই সভ্যযুগের বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সকরুণ মর্ম্মবেদনায়।

আজ সুবিমলের জন্মোৎসব। জন্মদিনে কোনও লেখককে যে এতটা সম্মান দেওয়া হয়েছে তা এই উৎসবের আয়োজন না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সুবিমল আজ আর কারও সঙ্গে বেশী কথা বলছে না, নির্জনতা খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। আজ তার জীবনে একটা নতুন শিহরণ এনে দিয়েছে এই পল্লীর তরুণেরা। সুবিমল এখন প্রায় যৌবনের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছে। চুলে একটু একটু পাক ধরতে শুরু করেছে। কদিনেই মুখটা যেন বেশ খানিকটা বুড়িয়ে গেছে। মাংসপেশীগুলো আর তেমন সবল মনে হয় না। চোখের নিচেটা কেমন যেন একটা কাল গহ্বরের আকার ধারণ করেছে, ঠোঁটের পাশটায় একটু খাঁজ পড়ে গেছে। জীবনীশক্তি কমে গেছে বেশ

খানিকটা, আর কোনও কাজে সে তেমন প্রেরণা পায় না। এত পেয়েও সুবিমল যেন একটা না পাওয়ার বেদনা অনুভব করে মনে মনে? দেহের শৈথিল্য মনের শৈথিল্য বলে ভুল করে সে। সভা-সমিতিকে সে ভয় করে বেশ। সেখানে গেলেই কিছু বলতে হয় নতুন নতুন করে। কিন্তু এত নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহের অদম্য শক্তি তার কোথায়? সব স্তিমিত হয়ে এসেছে ধীরে ধীরে। দেহের শক্তি কমে গেছে মনের শক্তির সঙ্গে তাল রেখে।

দো-তলার একটা ঘরে নির্জনে সুবিমল আজ বসে চিন্তা করছে। জীবনে সে কি পেল আর কি পেল না; অনেক পেয়েও না-পাওয়ার ব্যথায় কেন সুবিমলের এই বুকটা টন্‌টন্ করে? সুবিমল তো জীবনের শুরু থেকেই একটা উল্কার মত হঠাৎ একটা সংসারে এসে উপস্থিত হয়েছিল, এমনি হঠাৎই একদিন সাহিত্যিকের সম্মান তার ভাগ্যাকাশে দেখা দিয়েছিল। এর জন্যে তাকে খুব বেশী কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি; একটু ধৈর্য ধরে একটা একটা করে এতগুলো শুধু আত্মসাৎ করতে হয়েছিল তাকে।

মিলাও তার জীবনে এসেছিল ঠিক ওই উল্কারই মত, সে চলেও গিয়েছিল ঠিক ঐ লক্ষ্যভ্রষ্ট গ্রহের মত। কোনওদিন আর এসে সে তার জীবনকে বিষিয়ে তোলার জন্যে একবারও অনুযোগ করেনি। আর ফিরে আসেনি সে, হয়তো সরল প্রফেসর স্বামী একদিন কুটিল স্বামীতে রূপান্তরিত হয়ে আবার তারই মত মিলাকে পথে নামিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, নয়তো সুখে ঘর সংসার করছে মিলা সুবিমলের ছোট্ট একটা ফুটফুটে ছেলে কোলে নিয়ে। এ দুনিয়ায় সবই সম্ভব। মিলাকে সুবিমল গ্রহণ করলো না কেন? আবার মনে হচ্ছে ভুল করেছে সুবিমল। তখন যদি এই ভুলটা তার মনের পর্দায় ধরা দিতো, তখন যদি মনে না হতো, একটা মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন কাটানো অসম্ভব! এ ভাবাটা যে কত বড় ভুল হয়েছিল ধীরে ধীরে

সুবিমল তা অনুভব করেছিল। কই আর তো কোনও মেয়েকে সুবিমল ঠিক মিলার মত গ্রহণ করতে পারেনি। আর কোনও মেয়ে তার সর্বস্ব সুবিমলকে তুলে দিতে আসে নি। কেউতো তাকে 'আর মিলার মত বলেনি, ওগো আমায় গ্রহণ করে ধন্য কর তুমি। আমি দু-হাত উজাড় করে দিলুম, নাও তুলে নাও। আর কেউ বলেনি, এমন করে, আর কেউ প্রাণ ঢেলে ভালবেসেনি সুবিমলকে। তবু সুবিমল গ্রহণ করেনি মিলাকে। তার জীবনের সব কিছু শেষ করে তাকে বাসি ফুলের মত ফেলে দিয়েছিল রাস্তায় ধুলোর উপর। নারীত্বের চরম অপমানে অপমানিত মিলা সেদিন নীরবে রাস্তায় নেমে এসেছিল। আর সুবিমল, সুবিমল সেদিন এক বোতল ওল্ড স্কচ্ হুইস্কি গলায় ঢেলে দিয়ে মাতলামি করেছিল মিলার ছবিটার দিকে চেয়ে। মিলার ওই একটা ছবিই ছিল সুবিমলের নাগালের মধ্যে। নেশার ঝোঁকে সেদিন সুবিমল ছবিটাকে পদদলিত করে ছিঁড়ে ফেলে-ছিল। তারপর একটা দেশলাইয়ের কাঠির আগুনে সুবিমলের মিলা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। আর কোনও চিহ্ন ছিল না মিলার। ঐ ছবিটার পোড়া ছাইয়ের মধ্যে। সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। চলে যাওয়ার দিনটি ছাড়া মিলা আর কোনওদিন সুবিমলের কাছে কোনও অনুযোগ, অভিযোগ করেনি, তবুও সুবিমল মিলাকে ভুলতে পারলো না। মিলা সেই কবে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। তবু আজও সে মিলার কথা নিরিবিলিতে বসে বসে ভাবে, মনে মনে অনুতাপ করে। অভিনয় করতে করতে অবচেতন মনে সুবিমল মিলাকে ভালবেসেছিল। এ ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হয়নি কোনওদিন, তবু অন্তরটা জুড়ে রেখেছে ঐ একরত্তি মেয়ে মিলা। সুবিমল এখন মিলাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায় মনে মনে, কিন্তু আজ মিলা কোথায়? দিগন্তে মিলিয়ে গেছে সে, আর সাড়া দেবে না সুবিমলের আকুল আহ্বানে। যে কঠিন আঘাত সুবিমল মিলাকে দিয়েছে, তার রেখা কোনও দিন মিলার জীবনে মিলিয়ে যাবে না,

আর ফিরে আসবে না সে। সুবিমলের জঘন্য হৃদয়ের যে পরিচয় মিলা তার জীবনের কঠিনতম মুহূর্তে হৃদয়ঙ্গম করেছে, তা ভুলতে পারে না সে। ভুলে সে যাবে না কোনও দিন, সুবিমলকে সে মনে রাখবে, তবে তার মনের কোমল মণিকোঠায় সুবিমলের ঠাঁই হবে না কোনওদিন—মনে থাকবে একটা বিভৎস জীবনের যবনিকার আড়ালে।

আজ জন্মদিনের এই মধুর মুহূর্তে আর একজনকে সুবিমলের বড় বেশী করে মনে হয়। সে সুবিমলের এই বন্দীশালায় বন্দী-জীবন কাটিয়ে চলেছে, সে তার আপন পিতার চেয়েও বড়—নন্দগোপাল রায়। এই জন্মোৎসব তো নন্দগোপালের জন্মোৎসব। তবু তার নয়, সে সব হারিয়ে অন্ধকারের আড়ালে। কেউ তাকে জানে না, চেনে না, জানতে চেষ্টা করে না, চিনতে চায় না। সুবিমল তাকে চেনে। মিলার মত সেও শুধু একদিন ছাড়া সুবিমলের কাজের আর কোনও প্রতিবাদ কোনওদিন করেনি, নীরবে বন্দী-জীবনের গারদ-খানায় কাটিয়ে যাচ্ছে নন্দগোপাল চরম অবহেলায়, তবুও প্রতিবাদ করেনি একদিনও। সুবিমলকে যে এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তাকেই সে এই সুন্দর পৃথিবীর প্রকৃতির আড়ালে বন্দী করে রেখেছে। আত্মসুখের জন্যে কারুর কথা সুবিমল এতদিন চিন্তাও করেনি। আজ তারই বাড়ীর লনে এ উৎসব-মুহূর্তে নন্দগোপালকে তার মনে পড়ে যায়। মানুষ নন্দ-গোপাল পশুর জীবন অতিবাহিত করে আজও কেমন করে বেঁচে আছে সুবিমল সেই কথাই ভাবছে আজ। অমানুষিক অত্যাচারে মানুষ কেমন করে জীবন ধারণ করে তারই একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নন্দগোপাল। সুবিমলের বাবা নাকি ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যায়। নন্দগোপাল সেদিন মায়ের মত একটু একটু করে দুধ খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। নন্দগোপালের পিতা অমৃতসরে ব্যবসায় অনেক অর্থ জমিয়ে রেখেছিলেন, নন্দগোপাল সুবিমলের পড়ার জন্যে তা

সবই ব্যয় করেছে। সুবিমল ভাবে, তার উপযুক্ত পুরস্কারই সে দিয়েছে তার জ্যাঠাকে—পালক পিতাকে। তার সবই যখন সে এই অভাজনের জন্যে ব্যয় করেছে, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিও কেন সুবিমল কাজে লাগাবে না। হাসি পেল সুবিমলের, আজ দ্বিতীয়-বার হাসল সে, প্রথমবার হেসেছিল ঠিক এমনি পৈশাচিক হাসি সেই ড্রইংরুমে—যেদিন মিলা চলে গিয়েছিল—যেদিন নন্দগোপাল আশ্রয় নিয়েছিল তার ঐ সুন্দর গারদ-খানার অন্ধকারে। সুবিমল আজ এই প্রথম ভাবলো, নন্দগোপালকে আজ থেকে একটু সুখে থাকতে দেবে। মনে করলো চাকরকে ডেকে বলবে, ওরে, আজ থেকে ওকে চান করার জল দিস, ভাতের সঙ্গে দু-একটা তরকারী দিতে ভুলিসনি, একটা নতুন কাপড় পরতে বলিস। একটা ভাল খাতা লিখতে দিস, নতুন একটা খবরের কাগজ এনে রাখিস, আর মাঝে মাঝে বাগানে রোদে বেড়াতে বলিস। পরক্ষণেই সুবিমল আবার ভাবলো, এখন আর এর কোনও প্রয়োজন নেই, সব প্রয়োজন তো ফুরিয়ে গেছে, এগুলো চাইলেও সে তো আর অন্তর দিয়ে চায় না, কোনওদিন অন্তর দিয়ে চাইবেও না, অন্তর তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নন্দগোপাল পাগল হয়ে গেছে। উন্মাদ নন্দগোপালের সমস্ত চাওয়া ফুরিয়ে গেছে। আর কোনও চাওয়া তার নেই, পাওয়া তার হয়ে গেছে অনেকদিন আগে।

চাকর এসে খবর দিল, অতিথিরা অনেকেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। মঞ্চ সাজান শেষ হয়ে গেছে, আপনার প্রতীক্ষায় সকলে বসে আছেন।

সুবিমল ধীরে ধীরে লনে নেমে এলো, সাদা চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নম্র হয়ে দাঁড়াল মঞ্চের একটা কোণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলার অধ্যাপক এসে নমস্কার করে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন,—শ্রদ্ধাস্পদ সুবিমলবাবু, বাংলাদেশের নতুন ঔপন্যাসিক শ্রীসুবিমল রায় বর্তমানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

৷ —ক্ষমা করবেন, অযোগ্যকে এতটা সম্মান দেওয়াটা ঠিক হবে কি ?

—যোগ্যকেই দেওয়া হচ্ছে ; সুতরাং বেঠিক যে হবে না, তা আপনাকে বলে দিতে পারি।

বাংলার নবীন আর প্রবীণ প্রায় সব লেখকই আজ সুবিমলের জন্মদিনে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কাজ শুরু হল—এক অনাড়ম্বর গাম্ভীর্যের মধ্যে।

সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক।

বাংলার লেখক গোষ্ঠী একটা মানপত্র অধ্যাপকের হাতে তুলে দিলেন। অধ্যাপক মানপত্রটা পড়ে শোনালেন উপস্থিত অতিথি-বৃন্দকে,—বাংলা সাহিত্য আজ তার সমৃদ্ধির দ্বারা, তার শ্রেষ্ঠ কলানৈপুণ্যের দ্বারা বিশ্বের দরবারে আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এই সম্মানের জন্যে দাবী করতে পারেন বাংলার দরিদ্র সাহিত্যিকবৃন্দ। যাঁরা জীবনের সমস্ত রকম আর্থিক প্রলোভন ত্যাগ করে, বাংলার সাহিত্যকে বলিষ্ঠ সুন্দর করে গড়ে তুলতে তাঁদের জীবনের সব কিছু উৎসর্গ করে দিয়েছেন। সাহিত্যিক-দের এ দান বাংলার তথা ভারতের পাঠকগোষ্ঠী সম্মানের সঙ্গেই স্বীকার করেন। আজ বাংলাদেশের সাহিত্যে নতুনের বলিষ্ঠ পদ-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মত তাঁরাও সাহিত্যের দরবারে আসন পেতে বসেছেন, আর এঁদের পুরোভাগে রয়েছেন, সাহিত্যিক শ্রীসুবিমল রায়।

আমরা তাঁর সুখী জীবন প্রার্থনা করি, কামনা করি তাঁর জীবনের সার্থক প্রচেষ্টার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

অধ্যাপক মানপত্রটি সুবিমলের হাতে তুলে দিলেন। অধ্যাপক আবার অভিনন্দন জানিয়ে সংক্ষেপে বললেন,—সম্মানিতের জন্ম-

বার্ষিক উপলক্ষে আগত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-অনুরাগীদের পক্ষ হয়ে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই সাহিত্যিক শ্রীসুবিমল রায়কে। এত অল্প দিনে তিনি বাংলার সাহিত্য-জগতে যে সম্পদ দান করলেন, তা অবর্ণনীয়। তাঁর এ দানের পেছনে যে অধ্যাবসায় আছে, যে সাধনা আছে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই কারও। আমরা তার সর্বশেষ উপন্যাসটি যখন পড়ি, তখন ভাবি, তিনি কত অমূল্য সময় আসানসোলের কোল-মাইনের কুলিদের জীবনী সংগ্রহে ব্যয় করেছেন। এই উপন্যাসটি পড়তে পড়তে আমাদের মন চলে যায় এই পৃথিবীর আলোবাতাসের বাইরে ঐ কোল-মাইনের খাদের মধ্যে। যখন একটু একটু করে গাঁইতি দিয়ে কয়লা কেটে তারা কালি হাতে ঘাম ঝাড়ে তখনকার সেই চরম মুহূর্তে। সুবিমলবাবুর প্রতিটি উপন্যাসে প্রাণের ছোঁয়া পাওয়া যায়। হৃদয়ের আবেদন এতে কত গভীরতায় উপলব্ধি করতে হয় প্রতিটি কথার ফাঁকে ফাঁকে।

এই নবীন অথচ সাহিত্যে প্রবীণ সাহিত্যিককে অভিনন্দন জানিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আশা করছি, তাঁর বলিষ্ঠ মসীতে আরও নতুন নতুন কাহিনী সংযোযিত হবে। নমস্কার।

অধ্যাপকের বলা শেষ হয়ে গেল। সুবিমলকে কিছু বলতে হবে এবার। ভাঁজ করা কাগজখানা খুলে সুবিমল বলতে শুরু করলো—প্রথমেই আগতদের ধন্যবাদ জানাল তাঁদের শুভাগমনের জন্য। সুবিমল বলে চললো—জীবনের তাগিদে অনেকের ছোঁয়া আমার হৃদয়ে লেগেছে, ঐ কোল-মাইনের কুলিরাও তাঁদের অন্যতম। যাঁরা এসেছেন, আমার জীবনের ইতিহাসে, তাঁদের কথা অকপটে স্বীকার করেছি আমার উপন্যাসের পাতায় পাতায়। তা যে আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছে, তা জেনে আমি সুখী। বিশ্ববিদ্যালয় আমায় যে সম্মান দিয়েছেন, তার যোগ্য আমি নই, অযোগ্যকে সম্মান দেন মহতেরা, মহতের কাজ তাঁরা করেছেন, আমি গ্রহণ করে ধন্য

হয়েছি। আমার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা সাধারণ মানুষ সম্মানের একটা অংশ আমি তাঁদের উৎসর্গ করতে চাই।......

করতালিতে মুখর হয়ে উঠলো সমস্ত প্রাঙ্গণ।

সুবিমল বলা থামিয়ে গ্রহণ করলো অভিনন্দন। মুহূর্তের জন্যে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো—গারদ-খানার জানালার রেলিংএর দিকে। উন্মাদ নন্দগোপালের পাংশু মুখের নিষ্পলক চোখ দুটো সুবিমলের দিকে চেয়ে আছে।

হাত থেকে ভাঁজখোলা কাগজখানা পড়ে গেল সুবিমলের, ভাষা গেল স্তব্ধ হয়ে। বক্তৃতা বন্ধ হয়ে গেল।

সুবিমল চঞ্চল হয়ে উঠলো ক্ষণিকের জন্যে। গারদ-খানায় ঢোকার পর এই প্রথম নন্দগোপালকে দেখল সুবিমল রায়। ধীরে ধীরে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। এমনি করেই শেষ হয়ে যাবে সুবিমল নিজে।

পনের

জানালার রেলিং ধরে বৃদ্ধ নন্দগোপাল এতক্ষণ সুবিমলের সম্বর্দ্ধনা সভার দিকে চেয়েছিল। জীর্ণ কঙ্কালসার দেহটা একটা মলিন আচ্ছাদনে খানিকটা ঢাকা রয়েছে, সভাশেষ হয়ে গেলে নন্দগোপাল একবার জোরে হেসে উঠলো—হেসে উঠলো এই ভণ্ড পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে। বন্দী নন্দগোপাল, নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ একাকী মনে করলো। এই বদ্ধ-জীবন তার আর ভাল লাগে না। একবার মনে হল ঐ সভায় তারও কিছু বলার আছে, তারও কিছু জানানর আছে, কেমন করে সে ধীরে ধীরে পাগল হয়ে গেল তার কাহিনী। সকলে জেনে যাক নন্দগোপাল কেন উন্মাদ হয়ে গেল? সভা শেষ হয়ে গেছে তবুও সে এই জন্মোৎসবে কিছু বলতে চায়, মুক্তি চায় সে এই বদ্ধ-ঘরের গুমোট অন্ধকারের মধ্যে থেকে। সেও

চায় ঐ সভায় দাঁড়িয়ে তার সাহিত্যিক জীবনের ইতিকথাগুলো বলে যেতে। মুক্তি চায় সে, ছুটে গেল নন্দগোপাল দরজার দিকে। বারবার আঘাত করে দরজার কাঠের পাল্লাগুলো ভাঙ্গতে চেষ্টা করলো, মাথা ঠুকলো বার বার, অসহ্য যন্ত্রনায় চিৎকার করে বসে পড়লো নন্দগোপাল দরজার ধারে। আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো সে তার বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। মুক্তি নেই নন্দ-গোপালের, মুক্তি নেই তার এই উন্মাদ জীবনের গণ্ডি থেকে; মুক্তি পেয়েও আর সে মুক্তি পাবে না, সব দরজা তার বন্ধ হয়ে গেছে, একথা কে বুঝাবে ঐ বৃদ্ধকে? বোঝাবার কেউ নেই, জানাবার মত কারও দেখা সে পাবে না এ জীবনে; বোঝালে, জানালেও আর বুঝবে না নন্দগোপাল। বোঝা আর জানার বাইরে নন্দগোপাল চলে গেছে।

নন্দগোপালের কান্না আর থামে না; শিশুর মত আকুল হয়ে বয়ে চলেছে তার কান্নার স্রোত। এ স্রোত হঠাৎ যে কখন রুদ্ধ হয়ে যাবে নন্দগোপাল নিজেও কি জানে? জানে না সে। কিছুই বোঝে না, জানা আর বোঝা ভুলে গেছে সে অনেক দিন আগে।

নন্দগোপাল ভাবে জীবনে অনেক কেঁদেছে সে, কে তার কান্না শুনেছে? কেউ না। কান্না থামিয়ে নন্দগোপাল হেসে উঠলো, হেসে উঠলো সুবিমলকে নিয়ে ছেলেখেলার ঐ বহির্দৃশ্য দেখে। চোখের সামনে নন্দগোপাল দেখতে পেল সুবিমলকে মালা দিয়ে সবাই হাততালি দিচ্ছে। বেশ করেছে, ঠাট্টা করে হাততালি দিচ্ছে সবাই। দেবে না! সবাই তো চেনে সুবিমলকে, জানে না তারা, জীবনে সুবিমল কত হাজার হাজার ছোট কাজ করেছে! মিলাকে মেরেছে, জ্যাঠাকে বদ্ধ-ঘরে বন্দী করে রেখেছে। তিল তিল করে সঞ্চিত লেখার পাণ্ডুলিপি নিজের নামে প্রকাশ করেছে। হাসবে না কেউ? হাসবে, হাততালি দেবে, ঠাট্টা, বিদ্রূপ করবে সুবিমলকে দেখে সবাই।

৷ নন্দগোপাল খুব খানিকটা হেসে নিয়ে হাততালি দিল—সুবিমলকে কল্পনায় দেখতে দেখতে। কল্পনার মুর্তি হঠাৎ কোথায় ভেসে গেল, সুবিমলকে দেখার লোভ সংবরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। দরজা তো খোলা সম্ভব নয়, জানালার গরাদগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হবে, তবেই সে মুক্তি পাবে। মুক্ত নন্দগোপাল সব জায়গায় অবাধভাবে চলে ফিরে বেড়াবে, দেখবে সুবিমলকে, ঠাট্টা করে হাততালি দেবে বাইরের ঐ লোকগুলোর মত। জানালার গরাদগুলো টেনে ফাঁক করতে চেষ্টা করলো সে, আপ্রাণ প্রচেষ্টা, যে কোনও প্রকারে সে ঐ লৌহ যবিনিকা ভেদ করবেই। এত শক্তি সে সঞ্চয় করে রেখেছে কেন? তাকে কাজে লাগাতে হবে, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে নন্দগোপাল। গরাদগুলো একটুও নড়লো না, একটুও বাঁক ধরলো না নন্দগোপালের প্রাণপাত পরিশ্রমে, ব্যর্থতায় মুসড়ে পড়লো সে, নিশ্চুপ, নির্বাক হয়ে বসে রইলো ময়লা মেঝের উপর। অনেকক্ষণ কোনও কথা কইলো না নন্দগোপাল।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে থেকে নন্দগোপাল আবার সচেতন হয়ে উঠলো। মনে মনে নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলে কল্পনা করে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠলো নন্দগোপাল। জানালার ধাপটায় বসে রইল—ঠিক যেন মসনদে নবাবের মত। পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল, সুবিমল তো তার সমস্ত লেখা নিজের নামে প্রকাশ করে দিয়েছে, তখনই নীচ সুবিমলকে অভিশাপ দিতে শুরু করলো মনে মনে।

পুরোন খবরের কাগজটা সে নিজের পাণ্ডুলিপি ভেবে একবার যত্ন করে মাথায় ঠেকাল, আবার যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখলো, পুরোন কাগজ, তখন রাগে ছিঁড়তে শুরু করলো সে।

শিখাকে তার মনে পড়ে। আবার নতুন করে শিখাকে নিয়ে উপন্যাস লিখবে মনস্থ করে পেনসিলটা নিয়ে কি যে লিখে চলে নন্দগোপাল, তা কেউ পাঠোদ্ধার করতে পারে না।

এমন হাজার হাসি-কান্নার মাঝে নন্দগোপালের প্রাণহীন দিন-গুলো বয়ে চলে। সাহিত্যিক নন্দগোপালকে কেউই চেনে না, চেনে উন্মাদ নন্দগোপালকে।

কে চিনলো না, আর কে চিনলো, এ নিয়ে নন্দগোপালের মাথা ব্যথা নেই একটুও ; সে নিজেকে নিয়েই থাকে। তার ছোট্ট সংসার ঐ ছোট্ট গারদখানার রেলিংগুলোর মাঝে।

হঠাৎ নন্দগোপালের লেখার ঝোঁকটা খুব বেড়ে গেল! মনে মনে সে একটা নতুন উপন্যাস শুরু করতে চায়। তার এই নতুন উপন্যাসের নায়ক হবে সুবিমল রায়; তার একক জীবনের কাহিনীই একটা উপন্যাসের পক্ষে যথেষ্ট বলে নন্দগোপাল মনে করলো। নতুন উপন্যাসের নায়িকা হবে মিলা সরকার, যাকে সুবিমল পথে বের করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, সেই মিলা।

উপন্যাস লেখার উপযুক্ত কাগজ ছিল না এই ঘরটায়। কয়েকদিন পর পর চীৎকার করার পর সুবিমল চাকরকে বলেছিল, কিছু সাদা কাগজ পাগলকে দেওয়ার জন্যে।

কাগজ পেয়ে নন্দগোপালের আনন্দ আর ধরে না, দু-হাত তুলে সেদিন আশীর্বাদ করেছিল সুবিমলকে। তার মঙ্গল কামনা করে নন্দগোপাল ঈশ্বরের কাছে অনেক কামনা করেছিল। তারপর নন্দগোপাল একেবারে মূক হয়ে গেল। আর কথা নয়, উপন্যাস লেখা শুরু করে দিল সেই বন্ধ-ঘরে। অন্ধকারে—জঘন্য নরককুণ্ডে। আর কথা বলেনি নন্দগোপাল। আর সুবিমলকে চিৎকার করে জ্বালাতন করেনি, আর খেতে না দিলেও সে খেতে চায়নি ভিখারীর মত।

নন্দগোপালের শুভকামনা, সুবিমলকে বিচলিত করেছে বেশ। সুবিমল তো নন্দগোপালকে উন্মাদে রূপান্তরিত করেছে। একজন মানুষকে এমন করে শেষ করে দেওয়া সে নিজেও কল্পনা করতে পারতো না কোনওদিন। কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না সুবিমল। আর আজ সে নিজে এইভাবে একটু একটু করে শেষ

করে দিয়েছে একজন সাহিত্যিকের জীবন। হয়তো সে আজও এমন কিছু লিখে যেত যা আগামী দিনের সঞ্চয় হয়ে থাকতো বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে। কিন্তু তার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে এই সুবিমল রায়। নন্দগোপাল আজ শুভকামনা করলো কেন? এর পরেও কি কেউ কোনও শুভকামনা করতে পারে? এ চিন্তাও সুবিমলের মনে ঠাঁই পায় না, অথচ আজ সে নিজে শুনে আশ্চর্য হয়ে ভাবছে, এ কেমন করে সম্ভব? কেমন করে সম্ভব হয় একজন মানুষের পক্ষে? এতো উন্মাদের অন্তরের একটা আলোড়নের বহিঃপ্রকাশ, সে কথা সুবিমল ভাল করেই জানে। যত চিন্তা করে ততই অনুতাপে জর্জরিত হতে থাকে, উন্মাদ নন্দগোপালের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে আসে।

এই প্রথম সুবিমল নন্দগোপালের গারদখানার দিকে এগিয়ে এলো। অনুতাপে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এই প্রথম এ ঘরের দরজা সে নিজে হাতে খুলে দিলো। চাকরকে হুকুম করলো তার দামী ধুতিটা এখুনি নন্দগোপালকে এনে দেওয়ার জন্যে। এবার মুক্তি দেবে সুবিমল নন্দগোপালকে; আর এ বদ্ধ-ঘরে আবদ্ধ করে রাখবে না সে; প্রকৃতির সঙ্গে মিলতে সুযোগ দেবে এবার সুবিমল নন্দগোপালকে। রুক্ষকেশে এবার একটু তেলজল দেওয়াবে সুবিমল। চাকর ধুতি নিয়ে এলো; নন্দগোপাল গ্রহণ করলো না, দরজায় আর তালা দিল না সুবিমল। নন্দগোপাল ছুটে বাইরে চলে এলো না। বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সুবিমল বদ্ধপাগল নন্দগোপালের দিকে। বারবার জ্যাঠাবাবু বলে ডাকলো বহুদিন পরে সুবিমল। জ্যাঠাবাবু কথাটা তারই কানে ফিরে আসতে লাগলো কেমন যেন কুটিল মুখভঙ্গি করে। নন্দগোপাল সাড়া দিল না। নন্দগোপাল এখন আত্মসমাহিত। সে নিজেকে নিয়ে এখন ব্যস্ত, কারুর আহ্বানে সাড়া দেওয়া এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুবিমল এগিয়ে গিয়ে এই প্রথম বহুদিনপর দুর্গন্ধময় নোংরা দেহে

হাত দিয়ে নাড়া দিল। নন্দগোপাল নড়লো না, সে এখন নতুন উপন্যাসের নতুন নায়িকাকে নিয়ে বড় ব্যস্ত। লিখে চলেছে মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত করে; সাড়া সে দেবে না। লেখার 'মুড্' এসেছে নন্দগোপালের। চাকর আজ একটু ভাল খাবার নিয়ে কতবার ডাকলো নন্দগোপালকে; নন্দগোপাল কিছুই খেল না। শতছিন্ন ময়লা কাপড়টা ছেড়ে নতুন কাপড়টা পরে আব্রু বাঁচাবার জন্যে কত করে অনুরোধ করলো সুবিমল, নন্দগোপাল ফিরেও চাইল না।

লিখে চলেছে নন্দগোপাল, নায়কের কঠিন চরিত্রে সে রূপদান করছে এখন। সাংঘাতিক দৃশ্যের অবতারণা করছে সে, নায়ককে নিয়ে। নায়ক বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করছে এখন, এখন নন্দগোপালের সময় নেই বাহ্যিক আকর্ষণে সাড়া দেওয়ার।

সুবিমল টুকরো কাগজগুলো পড়ার চেষ্টা করলো একবার, পড়তে পারলো না কিছুই। কি যে হিজিবিজি দাগটানা আছে টুকরো টুকরো কাগজের উপর, তার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে উঠলো সুবিমলের পক্ষে। চিন্তা করে এ লেখার একটু হদিস যদি পায় তার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু নিষ্ফল প্রচেষ্টায় বার বার প্রত্যাখ্যাত হল সে; কিছুই খুঁজে বের করতে পারলো না সুবিমল রায়। দামী ধুতিটা সুবিমল নন্দগোপালের গায়ে চাপিয়ে দিল একবার; নন্দগোপাল ছুঁড়ে ফেলে দিল তখনই; একবার সুবিমলের দিকে চেয়ে দেখলো সে। আবার লেখায় মনঃসংযোগ করলো তখনই। সুবিমলের শতচেষ্টা ব্যর্থ হল, কিছুই গ্রহণ করলো না নন্দগোপাল।

সুবিমল আবার ফিরে এলো দো-তলার বারান্দায়; প্রত্যাখাত হয়ে সে পায়চারী করতে লাগলো বারান্দার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। অনুতাপ, বিষাদতার তাপ সারা মন আচ্ছন্ন করে তুললো; এতটুকু প্রশান্তি সে পেল না মনে। বারবার ভাবলো, জীবনে এতো অন্যায় কি আর কেউ করেছে? আর কেউ কি আপন পিতাকে বন্দী করে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে?

ঔরংজীবের কথা মনে পড়লো তার, সেও বৃদ্ধ সাজাহানকে বন্দী করে ভায়েদের হত্যা করে রাজ্য দখল করেছিল; তবু সে সুবিমলের চেয়ে মহৎ। এমনি করে একটু একটু করে উন্মাদ করে তোলেনি বৃদ্ধ বাবাকে। এমন করে ছোট গারদখানায় বন্দী করেনি পিতাকে। আর সাজাহানও অত্যাচারী ছিল শোনা যায়, তার অমর কীর্তি তাজমহল গড়ে তোলার পর দাক্ষিণাত্যে নাকি পঞ্চাশ বছর দুর্ভিক্ষ চলেছিল; কিন্তু নন্দগোপাল, সে তো কাউকে পথে বসায়নি, বরং পথ থেকে তুলে এনেছিল, আশ্রয় দিয়েছিল তার ছোট্ট রাজপ্রাসাদে। জীবনের সব সঞ্চয়ের প্রতিদানে তাকে মানুষ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু মানুষের পরিবর্তে অমানুষ হয়ে উঠলো সে নিজে। প্রতিদানে দিল অন্ধকার কারাগার। সবকিছু আত্মসাতের পর পিতাকে উন্মাদ হওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে তুললো সুবিমল। সুবিমলের এ দান তো নন্দগোপাল গ্রহণ করতে পারে না, তাইতো প্রত্যাখ্যাত হতে হল তাকে নন্দগোপালের গারদখানা থেকে।

চাকর এসে বললো,—বাবু, অনেক বেলা হল, খেয়ে নিন?

—জ্যাঠাবাবু কিছু খেয়েছেন?

—উনিতো লিখেই চলেছেন।

—খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলি?

—অনেক চেষ্টাই করেছিলুম। কিছুই কাজ হয়নি।

আজ আমার খেতে ইচ্ছে নেই; ওগুলো কুকুরটাকে দিয়ে দে।

—কিছুই তো খাননি বাবু সন্ধ্যে থেকে।

—বোতলটা পৌঁছে দিয়ে যা।

—আজও মদ খাবেন বাবু?

—যা বলি শোন্, কোনও কথা শুনতে চাই না, তোকেও কি কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

—বাবু খাবারটা খেয়ে নিলে পারতেন?

—না। না। না।

—বেশ কুকুরটাকে দিয়ে দিচ্ছি।

—তার আগে বোতলটা পোঁছে দে ; দেরী হলে বিদায় নিতে হবে। অনেক চাকর পাওয়া যাবে এখানে। চাকর মদ আনতে ছুটে গেল।

ষোলো

সুজনের পথ-চলা শেষ হয়নি ; সুজনের অভিযান আজও স্তিমিত হয়ে যায়নি। তার যাত্রা-পথ একদিনও একটুও ছেদ টানেনি ; কলকাতার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তার এ যাত্রা চলে রোজই। প্রতিদিন সুজন কলকাতার এক একটা পল্লীতে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেরে মিলাকে ; সন্ধান পায় না ! তবুও সুজনের চলা বন্ধ হয় না।

মিলার কত কথা সুজনের মনে হয় ; মনে হয় মিলা হয়তো আর এ কঠিন শহরে নেই, কোনও অজানা দেশে হয়তো চলে গেছে। আর তা না হলে মিলা সুনিপুণ গৃহিণীর মত সংসার বেঁধেছে এত অজস্র গৃহের একটায়। কোথায় সন্ধান করবে সে ? কোথায় দেখা পাবে তার ? এ-চলার কি শেষ হবে না ? এ খোঁজার কি পরিসমাপ্তি সুজনের জীবনে হবে না ? মিলা কি আজও এমনি আড়াল করে রাখবে নিজেকে ? আত্মপ্রকাশ সে কি আর করবে না এই পৃথিবীর আলোয় ? হয়তো মিলা আর এ পৃথিবীর আলোয় বেঁচে নেই ! হয়তো তার জীবনের ছেদ এসেছে হঠাৎ কোনও অসতর্ক মুহূর্তে। কোথায় মিলা ?

সুজন মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যায়, ভাবে আর হয়তো দেখা পাবে না তার। হতাশায় বুকটা ভরে যায় সুজনের। আবার সুজন নিজেকে শক্ত করে নেয়, ভাবে এ কঠিন সাধনার ফল নিশ্চয়

সে লাভ করবে একদিন! একদিন এমনি এক মুহূর্তে সে দেখা পাবে মিলার।

অনুসন্ধানী-চোখ ঠিক সন্ধান করেছে! কলেজ-স্কোয়ারে একটা দোকান থেকে মিলা বের হয়ে দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে ফুটপাথ ধরে উত্তরে।

মিলা আর সে মিলা নেই; তার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। একটা আটপৌরে শাড়ি পরা মিলাকে মধ্যবিত্তের গরীব-গৃহিণীর মত দেখাচ্ছে দূর থেকে। মিলার দেহে আর সে রোমান্টিক আকর্ষণ নেই। মুখে আর সে কোমল লালিত্য নেই, নেই সে উদ্ধত স্তন-যুগলের মসৃণতটরেখা; তার খোঁপার আড়ালের শুভ্র বঙ্কিম গ্রীবা আর সুজনকে তেমন করে আকর্ষণ করে না!

তবুও কেমন যেন একটা মাদকতা আছে এই মিলার। জোয়ারের জলটা এখন বেশ থিথিয়ে এসেছে; তবু একটা সকরুণ আহ্বান আছে মিলার চোখের কোণে।

অনেকদিন পরে মিলা সুজনকে দেখলো। সুজনকে দেখে তার চলার গতি আজ আরও গেল বেড়ে। আশ্চর্য হয়ে গেল সুজন। মিলা কোথায় থামবে! কোথায় তার পুরোন দিনের একজন প্রত্যাখ্যাতকে ডেকে বলবে,—আমায় ক্ষমা কর সুজন, আমার সব শেষ হয়ে গেছে, তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছি বলে আমায় ক্ষমা কর তুমি। বিবাহিত জীবনে মেয়েরা যে স্বস্তি পায়, আমি তা পাইনি, তোমায় ভুলতে কষ্ট হয়; আজও তোমার কথা মনে হয় আমার, আর মনে হয় শিল্প-সংগঠনীকে।

কিন্তু মিলা কিছু বললো না, তার চলা গেল বেড়ে; যেন সুজনকে দেখা দিয়ে ভুল করেছে সে। সুজন তার পথ থেকে সরে যাক এখনি; সে চায় না তাকে। সুজনকে সে কোনওদিন মনে ঠাঁই দেয় না; কোনওদিন তার কথা একবার ভাবে না, তাকে দেখলে যেন মিলার ঘৃণা হয়। মিলা এগিয়ে চলেছে; সুজনকে সে দেখা দিতে চায় না,

সুজনকে মিলা জানাতে চায় না, সে কোথায় আছে, কি তার গুপ্ত-জীবনের কাহিনী। কেন সে এতদিন আড়ালে আছে একাকী? কেন সে প্রফেসরকে বিয়ে করে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখেছিল? কেন সে সুজনকে না জানিয়ে সুবিমলকে বরণ করে নিয়েছিল? এত প্রশ্নের সব উত্তর দেওয়া হয়ে যাবে, মিলা ধরা পড়ে যাবে সুজনের কাছে। সে এতো ছোট, তা সুজনকে প্রাণ থাকতেও জানতে দেবে না। না, না! সে সুজনের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে না। মিলার চলা আরও বেড়ে গেল। আরও দ্রুততালে সে এগিয়ে চল্‌ল এই জনবহুল কলকাতার পিচ্‌ ঢালা রাস্তা ধরে। এ চলা বেশ অস্বাভাবিক ভাবে চলা। অনেকে দাঁড়িয়ে দেখল, জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে মিলার দিকে চেয়ে রইল,—কেন ও চলেছে এত জোরে, সবাই যেন জিজ্ঞাসা করতে চায়; কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা মনেই জমা হয়ে থাকে, প্রকাশ করার সময় পায় না।

সুজনের সঙ্গে মিলার আজ লুকোচুরির খেলা চলেছে; সুজনও এগিয়ে চলেছে মিলার সঙ্গে চলায় তাল রেখে। এক একবার সুজন ভাবছে মিলা যখন তাকে চায় না, তখন সে চাইবে মিলাকে? তবুও নানা প্রশ্নের সমাধান আজও হয়নি সুজনের। এতদিনের যে ঘটনাগুলো একটা বড় ইতিহাসের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার সমাধান আজ একান্তভাবে চাই সুজনের। মিলা না চাইলেও সুজন চায় মিলাকে—এমন করে পালানর অর্থ কি জানতে চায় সে, জানতে চায় সুবিমলকে সবকিছু দিয়েও আবার প্রফেসরকে গ্রহণ করার পেছনে কি যুক্তি আছে? কি যুক্তি আছে শিল্প-সংগঠনীকে এভাবে ফেলে রেখে হঠাৎ সংসার বাঁধার পেছনে? কি যুক্তি আছে মিলার? সবই জানতে চায় সুজন। সুজন এও জানতে চায়, মনে মনে মিলা সুজনকে ভালবাসা দিয়েছিল কি?

মিলা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, সুজন আর দেখতে পাচ্ছে না

তাকে। ছুটে চলেছে সুজন! এতদিন পরে মিলার দেখা পেয়ে আবার তাকে হারাতে পারবে না সুজন। যাযাবরের মত সে আজ অনেকদিন ধরে মিলার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ আর মিলাকে সে পালিয়ে যেতে দেবে না। যেমনকরেই হোক তাকে পেতে হবে। সুজন এগিয়ে চলেছে অনুসন্ধানী-দৃষ্টি চারদিকে মেলে। আবার দেখা পেল সুজন, মিলা গলির আঁকাবাঁকা পথে ছুটে চলেছে।

সুজন ছুটে গিয়ে মিলার সামনে হাজির হলো। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলো,—এমন করে পালাবার অর্থ কি মিলা?

—বাড়ী এসো বলছি!

সুজন মিলার সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো, এবার চলায় মিলার আর কোন তাগিদ নেই।

মিলা যে ভয় পেয়েছে এতদিন! এতদিন যা প্রকাশ করতে চায়নি বিশেষ করে সুজনের কাছে; তার অতীত জীবনের সঙ্গে বর্তমান জীবনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখতে চেয়েছিল সে, কিন্তু আজ আর বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হবে না। আজ সবই উন্মুক্ত করে দিতে হবে সুজনের কাছে, যার কাছে সে নিজেকে অনেক বড় করে রেখেছে। যাকে সে শ্রদ্ধায় মাথায় করে রাখে, যাকে মিলা ভালবাসে, তবু প্রকাশ করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেনি কোনদিন। যাকে শ্রদ্ধা করে ভালবাসা চলে, বুকে জড়িয়ে ধরা যায় না, তাকে কেমন করে জানাবে মিলা তার জীবনের অন্ধকারের দিনগুলোর কথা? কেমন করে বলবে মিলা, সে সুজনের আড়ালে সুবিমলকে সবই দিয়েছিল? প্রতিদানে মিলেছে শুধু তিক্ততা আর অপমান। ঐ অপমানের বোঝা আজও বহে চলেছে সে পথে পথে।

এবার মিলা প্রবেশ করলো নোংরা একটা বস্তির গলি-পথে। এখানে সুজন আসেনি কখনও, কখনও সুজন জানতে পারেনি, কলকাতার বস্তির আসল অবস্থাটা কি? গলির 'মুখটা হঠাৎ

বাঁদিকে ঘুরে গেছে ; দুদিকের আটচালাগুলো যেন গলির উপর ঝুঁকে পড়েছে। কয়েকটা মাঠ-চালায় লম্বা লম্বা বাঁশ দিয়ে দেওয়াল-গুলোকে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। বিচিত্র-মানুষের সমাবেশ হয়েছে এই বস্তির ঘরে ঘরে। বহু অবাঙ্গালী আছে এখানে, অনেকে রান্নার ব্যবস্থা করছে ঘরের সামনে কাঁচা রাস্তাটির উপর। কয়লার ধোঁয়া বোঝাই হয়ে আছে কোথাও, কোথাও জলের বালতি নিয়ে লাইন পড়েছে—মাটির সঙ্গে মেশান ছোট জলের কলটার পাশে। হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী সকল জাতির মিলন ক্ষেত্র এই বস্তিটা। রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' কবিতাটি যেন এই বস্তিটা দেখেই লিখেছিলেন। বস্তির মধ্যে একটা ছোট চায়ের দোকানও আছে, তাতে বিস্কুট, পান, চা, বিড়ি, সবই পাওয়া যায়। সেখানটায় বেশ গুলজার করে রেখেছে বস্তির কয়েকটা তরুণ যুবক। নেপালী দুটো মেয়ে একটা ঘরের দাওয়ায় বসে উল বুনে চলেছে। এখানে মানুষ বাস করে বোধহয় সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে। এখানে জাতিভেদ যেমন নেই, তেমনি আছে পরস্পরের গভীর সহানুভূতি। এ উপলব্ধিটা অবশ্য মিলার ছোট্ট দাওয়ার সামনে এসে সুজন মনে মনে চিন্তা করে নিলো। মিলার ছোট্ট পৃথিবী, এখানে মিলা একা সম্রাজ্ঞী। কেউ নেই মিলাকে উপদেশ দেওয়ার, মিলাকে কারুর হুকুম তামিল করতে হয়না এখানে, বরং সুজন দেখল বস্তির দু'জন বিধবা বাঙ্গালী মেয়ে মিলার হুকুম তামিল করে চলে। দাওয়ার একপাশে ছোট একটা সেলাই মেসিনে ঐ দু'জন মেয়ে ছোট ছোট ফ্রক্ সেলাই করে চলেছে ; কাপড় কেটে দিচ্ছে একজন আধা বয়সের ছেলে ; চরম দারিদ্র্যের ছাপ তিনজনেরই মুখে স্পষ্ট ফুটে আছে! মিলার এ দাওয়াতেও বেশ দারিদ্র্যের ছাপ চোখে পড়ে।

মিলার এ অবস্থা দেখে সুজনের দু'চোখ জলে ভরে এলো, কোনও রকমে চোখের জল সংবরণ করলো সে। মনে মনে

ভাবলো, মিলার এ কি অবস্থা ! কেন এমন হল ? কোথায় মিলার সোনার সংসার ? কোথায় প্রফেসর স্বামী ! কোথায় মিলার বাবা-মা ! মিলা এখানে কেন ? আরও আরও প্রশ্ন সুজনের চারদিকে ভীড় করে দাঁড়াল। পূর্বের শত শত প্রশ্নেরই কোনও জবাব এখনও সুজন পায়নি, আবার আরও প্রশ্ন এসে হাজির হলো। সুজনের ক্ষোভে, দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করলো, মিলার এত পরিবর্তনের জন্যে সে স্তম্ভিত হয়ে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে শুরু করলো—আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা, তার সন্ধানে !

সুজন নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; মিলা ধীর পদক্ষেপে দাওয়ায় উঠে এলো, দূরে একটা রোগা বাচ্চা মেয়ে মিলাকে দেখে কেঁদে উঠলো। এতক্ষণ তো সুজনের এর প্রতি দৃষ্টি যায়নি। কে এই মেয়ে ! নিশ্চয় মিলার। মিলা মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে সোহাগ করে গালে চুমো খেলো। আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলো কয়েকবার ; আবার নামিয়ে রাখলো সে, মেয়েটি আবার কান্না শুরু করে দিল। এ-কে ?

সুজনের মাথায় আরও একটা প্রশ্ন এসে উপস্থিত হলো।

মিলা বললো,— হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? উঠে এসো।

সুজন কি যেন বলতে চায়, তবু বলতে পারে না।

মিলা আবার বলে,—কি, শুনতে পেলে না সুজন, আবার বলতে হবে দাওয়ায় উঠে এসো ; নীচে দাঁড়িয়ে কেন ?

এবার সুজন দাওয়ায় উঠে এসে মিলাকে জিজ্ঞাসা করলো,— তোমার মেয়ে মিলা ?

সাদা কাগজের মত মিলার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মুখ নামিয়ে নিলো সে ; এর কোনও জবাব দিল না। সুজনের মনে হল, মিলার সমস্ত রক্ত যেন এক নিমেষে শূন্য হয়ে গেল। পুতুলের মত প্রাণহীন মিলা দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। সব যেন কেমন উলট্ পালট হয়ে গেল শুধু এই একটা প্রশ্নে। এই একটা প্রশ্নের

মধ্যে যে এতো কথা, এত কাহিনী থাকতে পারে, যার জন্যে মিলাকে মৌন, নীথর হয়ে যেতে হয় তা আগে ভাবেনি স্বজন। যদি ভাবতো তবে এ প্রশ্ন এখন করতো না সে মিলাকে।

এই ছোট একটা প্রশ্ন শুনে মিলার অতীতকে মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল সুবিমলকে, মনে পড়ে গেল সুবিমলকে সঙ্গে নিয়ে তার হাসি কান্নায় ভরা রঙিন্ দিনগুলো। বৃদ্ধ নন্দগোপালের কথা মনে করে মিলা চমকে উঠলো। নন্দগোপাল আজও বেঁচে আছেন কিনা জানতে ইচ্ছে হল। উন্মাদ হওয়ার সংবাদ মিলা আগেই জেনে ছিল, মৃত্যু সংবাদটা শুধু পায়নি ; তারও জন্যে অপেক্ষা করে আছে সে। আর মনে পড়ল সুজনের সঙ্গে জড়ান শিল্প-সংগঠনীকে। মিলাই এই প্রতিষ্ঠানের মৃত্যুর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, একথা মনে পড়ায় মিলা অনুতাপে জর্জরিত হয়ে উঠলো। আবার ভাবলো, এই সংগঠনীর সংস্পর্শে এসেই তো ঐ অমানুষ সুবিমলের সংস্পর্শে সে এসে ভুলেছিল, ভুলেছিল তার বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই।

মিলা যে এখন বস্তির এই দাওয়ায় সুজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা প্রশ্নের জবাব এখনও দেয়নি এ কথা চিন্তা করতে পারছে না মিলা ? সে এখনও তার অতীতকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, মনের মাঝে সুবিমল, নন্দগোপাল আর শিল্প-সংগঠনী ঘোরা-ফেরা করছে। হঠাৎ যে কেমন করে তার বিয়ে হয়ে গেছে ; সে-কথা সে ভুলে গেল। মিলা ক্ষণেকের জন্যে তার কুমারী-জীবনে ফিরে গেছে ; যেখানে সুজন আছে, সুবিমল আছে, আছে বিধবাদের সংগঠন, শিল্প-সংগঠনীর ছোট ঘর দুটো। মিলা যেন এখনও এদেরই নিয়ে আছে ; ভুলে গেছে বিবাহিত জীবনের সকরুণ ইতিহাস।

সুজন মিলার এ অবস্থা থেকে মিলাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে, আর এ অস্বস্তিকর ঘোলাটে আবহাওয়াকে একটু হাল্কা করে দেওয়ার জন্যে বলে চল্‌লো,—মেয়ে হয়েছে তাতে লজ্জার কি আছে মিলা ? বেশ তো !

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে চমকে উঠলো মিলা। নিজের এ অবস্থার জন্যে লজ্জিত হয়ে উঠলো সে। সুজনের জিজ্ঞাসু-চোখের দিকে একবার নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখলো মিলা। মনে মনে ভাবলো, ধরা তো দিতেই হবে। ধরা সে পড়ে গেছে, নিজেকে ঢেকে রাখা আর সম্ভব নয় সুজনের কাছে। এবার আত্মপ্রকাশ করবে সে, সব-ই প্রকাশ করে দেবে, সে জানাবে তার অতীত জীবনের অন্ধকারের সকরুণ ইতিহাস, দীনতা, হীনতা-মাখান দিনগুলোর কথা। মিলা জবাব দিল,—দাওয়ায় নয়, ঘরের ভেতরে বসবে চল, সবই বলছি! লজ্জার কারণ এতে আছে।

সতের

মিলার ছোট ঘর, চারটি ছোট ছোট মাটির দেওয়াল, ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার। এক কোণে রবীন্দ্রনাথের ছোট একটি মূর্ত্তি, খাটের পাশে একটা বড় বুক-সেল্‌ফ্‌। বিদ্যাপতি থেকে রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চিত কাব্যসম্ভার। দেওয়ালের একপাশে মিলার বিবাহিত জীবনের ছবি; স্বামী-স্ত্রী; সাদা কাগজের একটা মালা ঝোলান।

সুজন খাটের এককোণে বসে প্রথমে মিলা আর তার স্বামীর যুগল ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। প্রফেসরের চোখ দুটোর একটা দার্শনিকের মনোভাব সুজন লক্ষ করলো। সুজন ভাবলো, মিলার বিয়ে হয়ে গেছে, সে আর কুমারী মিলা নেই; তার একটি মেয়ে আর ঐ সুন্দর অধ্যাপক স্বামী। কিন্তু কোথায় কি? সব যেন কেমন খাপছাড়া, ছন্নছাড়া ভাব। সবটাই যেন কেমন একটা ঘোলাটে, স্বচ্ছতা নেই কোথাও। মিলার জীবনের সমস্ত আকাশটাই যেন কেমন মেঘলা; এতটুকু ফাঁক নেই যে একটু পরিষ্কার সূর্যের আলো চোখে পড়বে। বর্ষার পূর্বাভাষ সবখানেই। মেঘমুক্ত হওয়ার লক্ষণ কোথাও সে দেখতে পেল না।

মিলা বললো,—কি দেখছো? আমি আর আমার স্বামী! অতকরে দেখবার মত ওখানে কিছু নেই।

সুজন চুপ করেই ছিল, এখনও কথা বললো না, চোখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সেল্‌ফ-এর দিকে নিয়ে এলো, একটার পর একটায় চোখ বুলিয়ে বইগুলোর নাম লক্ষ করলো। সুবিমলের লেখা একখানাও উপন্যাস সুজনের চোখে পড়লো না। বেশ খানিকটা আশ্চর্য হয়ে গেল সে। ভাবলো, আধুনিক কবিদেরও অনেক বই এতে আছে; তবে উপন্যাস নেই একখানাও, মিলা কি কবিতা খুব ভালবাসে?

তা বাসুক; কিন্তু সুবিমলকেও তো মিলা ভালবাসতো কুমারী-জীবনে। সুবিমলের উপন্যাসের সুখ্যাতি করতে সে দেখেছে অনেকবার, কারণে-অকারণে সুবিমলের উপন্যাসের কথা উল্লেখ করতো মিলা, তবে তার দু-একখানাও এখানে নেই কেন?

সুজন রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যখানা হাতে তুলে নিলো।

মিলা বললো,—ততক্ষণ বইখানার পাতা উল্টাও, আমি একটু চা করে আনি!

—আবার চা কেন?

—খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ যে!

—কে, আমি?

—হ্যাঁ, তুমি, কতক্ষণ আমার পেছনে পেছনে ধাওয়া করেছ একবার চিন্তা কর তো?

—তোমারও ক্লান্ত হওয়া উচিত, জোরে চলা নিশ্চয় তোমার অভ্যেস নেই; বাবা! আজ যা জোরে হাঁটছিলে!

—তা আছে! মাঝে মাঝে তুমি না হলেও, তোমার মত আরও দু-একজন ধাওয়া যে করে না, তা-নয়; উপায় কি বল? রাস্তায় রাস্তায় যখন ঘুরতে হয়!

—কিন্তু কেন?

—বলছি, একটু বস। চা-টা করে আনি।

মিলা চলে গেল, সুজন সোনার তরীর পাতা উল্টাতে শুরু করলো, সোনার তরী কাব্যখানা খুলে সুজন ভাবতে লাগলো ; এই মানুষের জন্যেই তো আমাদের যত ভাবভাবনা। মানুষের জন্যে কবিরা, দার্শনিকেরা, সাধারণ মানুষেরা কত ব্যাকুল হয়ে আছে। সকলের কাছে পৌঁছতে চাই, সকলের মনের কাছে যেতে চাই, আগত, অনাগত সব মানুষের দুয়ারে যাওয়াই হল মানুষের ধর্ম। কিন্তু এই মানুষ কেমন করে সকলের দ্বারে গিয়ে পৌঁছবে? সকলের মনের সঙ্গে কেমন করে মানুষ আপন মনের তার এক সুরে বেঁধে দেবে? এই তো মানুষের সমস্যা, কবির সমস্যা।

আমার যা কিছু অদেয়, আমি তো দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কেমন করে দেব? এই দেওয়ার সমস্যাইতো কবির জীবনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই ক্ষরধারা নদী কেমন করে পার হয়ে যাব। আকাশকেও বিশ্বাস করতে পারি না, তার মেঘ গর্জন শুনতে পাচ্ছি। কেউ কি নেই, ঐ উদ্ধত ঢেউগুলোকে নিরুপায় করে আমার কাছে গান গেয়ে তরী নিয়ে আসে? দেখেই আচম্বিতে যদি চিনে ফেলি, হৃদয়ে আশ্বাস জাগে, প্রেরণা পাই। প্রেমের আবেগে সব কিছু দিতে পারাটাকেই ভাগ্য বলে মনে করি! যখন নেওয়ার কথা ভুলে যাই ; দেওয়াটাই জীবনে বড় হয়ে দেখা দেয়,—তখনই সে আসে, জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন তুলে দিয়ে ধন্য হই।

হায়! এ জীবনটা পড়ে থাকে! কতটুকু বা কমল ফলাতে পারি এখানে? মিথ্যা কথা, এ পারেও আছে। এই তো এপারের হাসি-কান্না, স্নেহ-ভালবাসা, আশা-নিরাশা, এরও দাম আছে। এশুধু ছেলেখেলা নয়, এ-পারের মাটিতেও সোনা আছে, এ-মাটিতে প্রতিমা গড়ে উঠে। যা আছে, তাতেই গড়ে তোলা সম্ভব স্বর্গের সুষমা। এতেই প্রেম হতে পারে, অহংটা কাটিয়ে যদি নিজেকে

ব্যাপ্ত করে দিই, এ-ই মাটিতেই যদি সোনা ফলাই, সোনার তরী নিয়ে যাবে।

মানুষের জীবনে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু মহৎ, তারই তো ঠাঁই হয় ঐ সোনার তরীতে; তাইতো অক্ষয় হয়ে থাকে মানুষের জীবনে।

কবি তো বলেছিলেন,—"পরপারে ছিল ছায়া ঘন-পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন সংগমের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখ দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।·····

কাব্যকরা থাক্! এটুকু খেয়ে নাও। মিলা এসে হুকুম করলো।

সুজন বললো,—ভাবছিলুম, জীবনের কিছুই সোনার তরীর জন্যে রেখে যেতে পারলুম না।

—অনেক কিছুই রেখে দিলে; কালের তরীতে তোমার অনেক কিছুই ঠাঁই পাবে।

—কি করে পাবে? এখনও তো জীবনে প্রেম হয়নি; যতক্ষণ প্রেম হয়নি, ততক্ষণ এ জীবনের তো কোনও মূল্য নেই মিলা।

মিথ্যা কথা! তোমার জীবনে শোক আছে, দুঃখ আছে, মোহ আছে, প্রেম আছে, এ-সব নিয়েই তো তোমার জীবনের অস্বস্তি। আর এ-সব তোমার হয়েও তোমার নয়, সকলের। ব্যক্তি বাসনা তো তোমার নেই, আর নেই বলেই তুমি এখানে কতদিন পরে এসেছ। কাব্যি থাক্, এবার চা-টুকু খেয়ে নাও।

সুজন সোনার তরী বন্ধ করে ডিস্‌টা হাতে তুলে নিলো।

মিলা সুজনের জন্যে দুটো পরোটা, একটু আলু ভাজা আর এক পেয়ালা চা সঙ্গে এনেছিল।

চা-টা মিলা খাটের পাশের একটা টুলে নামিয়ে রাখলো, সুজন ডিসটা হাতে নিয়ে অনুযোগের দৃষ্টি মেলে মিলার দিকে চাইলো।

মিলা বল্‌লো,—অ-লক্ষ্মী হতে পারি, কিন্তু লক্ষ্মী আমার ঘরে আছে, ওটুকু খেয়ে নাও।

—এ-কথার অর্থ কি মিলা।

—চাল বাড়ন্ত হয়নি ; এ বেলার খাওয়া এখানে সেরে যেতে হবে।

—তা হয় না মিলা।

—খুব হয়, কতদিন তুমি আমার হাতের রান্না খাওনি বলতো ? এখন অতিথিকে ছেড়ে দিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।

—আমার সমস্ত প্রশ্ন তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ মিলা ?

—সব মনে আছে ! উত্তর তুমি পাবে।

এতক্ষণ সোনার তরী পড়ছিলে, কাব্যের ছন্দপতন হবে বলেই ওগুলো এখনও জমা করে রেখেছি। সব-ই জানাব। এতটুকুও ঢাকবো না তোমার কাছে। তোমাকে না-জানালে আমার যে স্বস্তি নেই সুজন।

—তবে এতদিন জানাওনি কেন ?

—ধরা পড়ে যায়নি বলে ; আজ যখন ধরা পড়ে গেছি, উপায় নেই, পালিয়ে যাওয়ার তো চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

—তবে যে বললে স্বস্তি নেই।

—নেই তো ! এতদিন এতটুকুও স্বস্তি পাইনি। আজ বাধ্য হয়েই স্বস্তি পেতে হবে !

—কিছুই বুঝতে পারছি না।

—না বোঝার কিছু নেই তো। একটু বসো, এখুনি আসছি।

মিলা আবার চলে গেল, দাওয়ায় যে দু-জন বিধবা মহিলা

সেলাই করছিল, তাদেরই মধ্যে একজনকে ডেকে মিলা বললো,—সুধাদি, আজ তুমি আমার রান্নাটা করে দাও। আমরা দু'জন আছি; ছেলেবেলার এক বন্ধুকে পেয়েছি। গল্প করার লোভ সামলাতে পারছি না।

—বেশ তো, তুমি গল্প কর, আমি রান্নাটা সেরে নিচ্ছি।

—দেখ ভাই, রান্নাটা যেন খাওয়া যায়, বন্ধুটি অনেকদিন পরে এসেছে।

—আচ্ছা তোমায় আর ভাবতে হবে না।

মিলা ফিরে এসেছে।

সুজন জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা মিলা, সুবিমলবাবুর একখানাও বই তোমার সেল্‌ফে দেখছি না কেন?

—এখন আর ভাল লাগে না বলে।

—একদিন তো লাগতো।

—তখন কাছে কাছে রাখতাম।

—তখন তো সুবিমলবাবুকে রাখতে।

—হ্যাঁ।

—এখন কি দুটোই ভাল লাগে না?

—তা ঠিক নয়, লেখা খুব খারাপ লাগে না, তাই লাইব্রেরী থেকে এনে পড়ে আবার ফেরৎ দিয়ে দিই; কিন্তু সুবিমলকে আর পছন্দ করি না।

—কেন?

—আবার তোমার সেই পুরোন প্রশ্নে ফিরে যাচ্ছ।

—ওগুলো যে মাথার মধ্যে জোট পাকাচ্ছে।

—খাওয়ার পর ও প্রশ্নের জবাব পাবে! এখন বল, তোমার খবর কি? কোথায় ডুব দিয়েছিলে?

—ছোট একটা থানায়, এমন কিছু নয়, আর খবর তো তোমার কাছে, আমার খবর ছিলো, সে শুধু তোমায় খোঁজা, আর না

পাওয়ার খবর ; এখন পেয়েছি। আর সব খবর-ই শেষ হয়ে গেছে।

—আরও একটু বসো ; সুধাদিকে দিয়ে মনে শান্তি পাচ্ছি না, কি যে রেঁধে রাখবে ? এতদিন পরে এলে, একটু বসে কথাও বলতে পারছি না।

মিলা আবার রান্নার তদারক করতে সুধার কাছে চলে গেল।

সুজন বসে বসে কড়িকাঠ গুনতে গিয়ে দেখলো, ঘরে কড়িকাঠ নেই, বাঁশের কন্‌চিতে মাটি দিয়ে মাঠকোঠা করা হয়েছে। সুজন সোনার তরী বইটা আবার হাতে করে নিয়ে মিলার কথা ভাবতে লাগলো। মিলা তার কোন প্রশ্নের কোনও জবাব এখনও দিলো না। সবই যেন সে এড়িয়ে যেতে চায়। কোনও কিছু প্রকাশ করতে তার অজস্র দ্বিধা! কেন দ্বিধা ? এর আড়ালে কি ইতিহাস লুকিয়ে আছে ? সুবিমলকে মিলা আর পছন্দ করে না কেন ? কেন সে তার একটা বই ঘরে রাখতেও অস্বীকার করে। কেন আর তাকে তার ভাল লাগে না, একদিন যাকে না দেখলে মিলাও স্বস্তি পেতনা, তার অভিসার-লগ্ন প্রতিদিনই ছিল আলোকোজ্জ্বল, ছিল সুন্দর প্রাণময় ; আর আজ তাকে ঘৃণা কেন ? সুবিমলও মিলাকে না-চেনার অভিনয় করলো কেন ?

এ সহস্র কেনর উত্তর সুজন পেল না, চিন্তায় ছেদ পড়লো, কারণ মিলা এসে হঠাৎ বলে উঠলো, অনেকক্ষণ একা একা বসিয়ে রাখলুম বলে কিছু মনে করো না, রান্না হয়ে গেছে। তুমি কি স্নান করে এসেছ ?

—হ্যাঁ।

—তবে হাতমুখ ধুয়ে নাও।

মিলা দাওয়ায় জল নিয়ে এলো, সুজন আর কোনও দ্বিধা না করে জলের সদ্‌ব্যবহার করে ঘরের মধ্যে খেতে বসলো।

মিলা পাশে বসে বললো,—আজ লজ্জা না করে এ কটা মুখে তুলে দাও।

—এ কটা হলে তো ভাবনা বা লজ্জার কোনও কারণ থাকতো না।

—যা পার খেয়ে নাও; অনেক বেলা হয়েছে, তোমার প্রশ্নের উত্তরগুলো এখনও দেওয়া হয়নি। আমাকেও খেতে হবে।

—তুমি যাও না, ও কাজটা সেরে এসো।

—তা হয় না।

—আচ্ছা মিলা, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমার এতো দ্বিধা কেন?

—কারণ না থাকলে দ্বিধাও থাকতো না। উত্তরগুলো শুনলে বুঝবে। এখন এগুলো খেয়ে নাও।

আঠারো

খাওয়ার পালা শেষ হয়ে গেলো।

সুজন খাটের সেই কোণটায় এসে বসলো। মিলা উঠে গিয়ে আধ-ঘুমন্ত ছোট মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে সুজনের পাশে এসে দাঁড়াল।

সুজন বললো,—মিলা, এবার বলো তোমার কথা।

মিলা মেয়েটাকে নিয়ে সুজনের পাশে বসে বললো,—আমার কথা বলার আগে তোমায় একটা অনুরোধ করবো সুজন।

—কি তোমার অনুরোধ মিলা?

—আমায় যদি তুমি অসাধারণ ভেবে থাক ভুলে করেছ। আমি অতি সাধারণ মেয়ে; রক্ত মাংসে গড়া মানুষ; আমার জীবনে চাওয়া আছে; আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, কাম-মোহ কোন কিছুই থেকে আমি বাদ নেই। আমার জীবনে প্রথম যৌবনে অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলুম; অনেক ভুল করেছিলুম জীবনে; সাধারণে যেমন ভুল করে ঠিক তেমনি। আমার এ ভুল-ভ্রান্তির জন্যে প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি; বল ক্ষমা করবে।

—কিছুই না জেনে ক্ষমা করার কথা চিন্তা করবো কি করে মিলা ? আর কোনও অপরাধ তুমি করেছ কিনা তা আগে জানব বা কেমন করে ?

—হ্যাঁ, অনেক অন্যায় আমি করেছি সুজন। ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি আমায় না দিলে আমার কথা তোমায় বলবো না।

—বেশ কথা দিচ্ছি।

এবার মিলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

সুজন বললো,—সঙ্কোচ কেন মিলা ?

মিলা একবার মেয়েটার দিকে সকরুণ চোখে তাকিয়ে সুজনকে বলে চললো,—এই যে মেয়েটাকে দেখছ, আমার কোলে ঘুমিয়ে আছে পরম নিশ্চিন্তে, আমি এর মা। এ আমার স্বামীর নয়, আমার জীবনের এক চরম দুর্বল মুহূর্তে সুবিমলের দেওয়া এ মেয়ে। সুবিমলকে আমি বিশ্বাস করেছিলুম, সুবিমলের ভালবাসার অভিনয়ে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম। ভুল করেছিলুম সুজন। আমার জীবনের এ সর্বনাশের ইঙ্গিত যখন আমি নিজে উপলব্ধি করলুম; তখন সুবিমলকে কত বোঝালুম, তার পায়ে ধরে কত সাধলুম, ছেলেমানুষের মত আকুল হয়ে কাঁদলুম; ঝিয়ের মত একটু আশ্রয় চাইলুম; সুবিমল আমায় গ্রহণ করলো না, আশ্রয়ও দিল না তার বাড়ীর একটা কোণে। সুবিমলকে মানুষ ভেবেছিলুম, ভুল করেছিলুম। এখন ঘৃণা করি তাকে, আর আমাদের মত মেয়েদের, যারা পুরুষের বাইরের আবরণ দেখে ভুলে যায়, ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে না, তাদেরও। সমস্ত পুরুষ জাতটার উপর প্রথমে আমার ঘৃণা হয়েছিল, বিষাক্ত সাপের মত তাদের মনে করতুম, প্রথম প্রথম কাছে যেতে ভয় হতো, দূর থেকে সরে দাঁড়াতুম। সুবিমলের জঘন্য মনোবৃত্তির কথা মনে হলে এখনও কেঁপে উঠি।

—তারপর।

—তারপর আত্মসম্মানের ভয়ে বাবা আদালতের আশ্রয়ে না গিয়ে এক ভালমানুষ প্রফেসরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেন। স্বামীর লেখা-পড়া নিয়ে দিনগুলো কেটেছিল; নিজের সাধনা নিয়েই তিনি তাঁর প্রথম জীবনটা পার করে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর কঠিন বাস্তবের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে আর কোনও সংস্পর্শ তাঁর ছিল না, মেয়েদের তিনি খুব বড় করে ভাবতেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সাধনা যাতে সফল হয়, ভবিষ্যৎ জীবনটা যাতে সুন্দর করে তারা গড়ে তুলতে পারে, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যাতে তাদের সৃষ্টি আরও নির্মল হয়ে উঠে, এই ছিল তাঁর কামনা। আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয়, যে, মেয়েদের তিনি বড় ভাবতেন, আমি মেয়ে হয়ে তাঁর সে ধারণা পাল্‌টে দিলুম। আমি তাঁকে যে আঘাত দিয়েছি, সারা জীবনেও সে আঘাতের ক্ষত-চিহ্ন তাঁর মন থেকে মুছবে না। প্রথম প্রথম অভিনয় হয়েছিল আমার বিবাহিত জীবনের পেশা, কিন্তু বেশীদিন আর আমায় কষ্ট করে অভিনয় করতে হয়নি। একদিন ধরা পড়ে যাই। স্বামীর কাছে সবই অকপটে বলেছিলুম, তিনি আমায় অপমান করেন নি, ঘৃণাভরে দূরে সরিয়েও দেননি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কেমন যেন হয়ে গেলেন, মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর কথায় কথায় আর প্রকাশ পেত না। সাধনা তাঁর বন্ধ হয়ে গেল; সন্ধ্যের সময়ও ছাত্র পড়ানর নাম করে তিনি প্রায়ই সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরতেন রাত প্রায় বারটায়। দেখতে দেখতে চেহারায় তাঁর পরিবর্তন হল যথেষ্ট। সৌম্য মুখখানায় কেমন একটা ব্যর্থতার ছাপ ফুটে উঠলো ধীরে ধীরে। দেহের শক্তিও অনেক কমে গেল। এমনি করেই অনেকগুলো দিন কেটে গেল। একদিন প্রফেসর কলেজে গেছেন। এ-মেয়ের শুভাগমনের কথা আমার আর অজানা রইল না একটা ট্যাক্সি ডেকে হাসপাতালের নার্সের আশ্রয় নিলুম আমি।

হাসপাতালে তিনি আমার মেয়েকে দেখতে এলেন না, আর সংবাদও নিলেন না তিনি, আমি বেঁচে আছি, কি শেষ হয়ে গেছি!

আর দেখা হল না, ওখানেরই একটা মেথর এই সুন্দর আশ্রমের ব্যবস্থা করেছিল, তাকে আমি কোনওদিন ভুলবো না। সেই মেথরই আমার অসময়ের বন্ধু, আশ্রয় দাতা। তার আশ্রয়ে চলে এলুম। এখানে এসে যাতে আমার কোনও অসুবিধে না হয় তার জন্যে তার পরিশ্রমের শেষ ছিল না। মানুষ যে আজও পৃথিবীতে আছে, তা আমি তার আশ্রয়ে এসে বুঝলুম। যাকে এতদিন ঘৃণা করতুম, আজ তাকে মাথায় করে রাখতে ইচ্ছে হয়। আর যাকে ভালবেসে বিশ্বাস করেছিলুম, তার কথা মনে হলেই ঘৃণায় সারা মনটা বিষিয়ে উঠে।

আর দুঃখ হয় বৃদ্ধ নন্দগোপালবাবুর জন্যে; নন্দগোপালবাবুকে হয়তো তুমি চেন না; তিনিই ঐ কালসাপকে খাইয়ে বড় করেছেন; অমৃতসরে তিনি থাকতেন, সুবিমলকে রাস্তা থেকে নিয়ে এসে ঘরে তুলেছিলেন, লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন তিনি। আর সুবিমল! সুবিমল প্রতিদানে বৃদ্ধের লেখা, সারাজীবনের সঞ্চয় চুরি করে নিজের নামে প্রকাশ করে, সে আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত সুসাহিত্যিক।

আমাকে যেদিন প্রথম পথে নেমে আসতে হল, সেইদিনই তিনি এসেছিলেন সুবিমলের কাছে তাঁর সর্ব্বস্ব চুরির সংবাদ পেয়ে। আমার প্রতি সুবিমলের চরম অনাচার তিনি সহ্য করতে পারেননি। সুবিমল সেদিন তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল ছোট্ট একটা অন্ধকার ঘরে। আলো-বাতাস সেখানে ছিলনা, মুক্তি সেখানে ছিলনা, অন্ধকারের মধ্যে তিলে তিলে শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছাই বোধহয় সুবিমলের ছিল। রাস্তায় নেমে আসার পর বহুদিনই তাঁর কোনও খবর পাইনি, আমার মনের যে অবস্থা তখন ছিল, তখন নিজে আমি অসহায়, কেউ ছিল না আমায় একটু সান্ত্বনা দেয়, আশার কথা শোনায়; নিজেকে নিয়েই তখন আমি ব্যস্ত। তারপর যখন নন্দগোপালবাবুর সংবাদ অনেক কষ্টে সংগ্রহ করলাম; তখন তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন।

আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো মিলা। এই প্রথম মিলা আবার এমন করে কাঁদলো ; যখন প্রথম সুবিমল তাকে রাস্তায় বের করে দিয়েছিল, চাকরটা সেদিন বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল, সেদিনও মিলা এমনি করেই কেঁদেছিল।

মিলা তার অতীত জীবনের প্রায় সমস্ত কাহিনী এক নিমেষে বলে গেল। বলার সঙ্গে সঙ্গে তার অতীতের কুৎসিৎ ছবিগুলো মনের পর্দায় একটা একটা করে ভেসে উঠেছিল, সে অতীতে আবার ফিরে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। সেখানের এই সকরুণ ছবিগুলো আবার নতুন করে ধরা দিয়েছিল মিলার মনে।

মিলা আজ অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো ; ধীরে ধীরে তার মনের গ্লানি অনেকটা কেটে গেল চোখের জলে ; এই পুঞ্জীভূত বেদনার কথা আর কাউকে বলা হয়নি ; সবটাই একান্ত নিজের করে জমা করা ছিল, আজ ভাগ দিল তার একান্ত প্রিয় সুজনকেও। মিলা মুক্তি পেল খানিকটা, স্বস্তি পেল অনেকখানি। কান্নায়-ভরা দিনগুলো এতদিন পরে তার অতীত বলে মনে হল, মনে হল সেই বীভৎসকালটা শেষ হয়ে গেছে। আবার হয়তো নতুন সূর্য উঠবে মিলার জীবনে অন্ধকারের শেষপ্রান্তে পূর্ব-আকাশের তলায়।

মিলার কান্নায় সুজন বাধা দিল না, তার মনটাকে আরও খানিকটা হাল্‌কা করে নেওয়ার সুযোগ দিল সে।

সুজন ভাবলো সুবিমলের কথা। এত বড় একটা জঘন্য পাপী আজও কেমন করে সমাজের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ! আজও শত শত মানুষ কেমন করে তার মিথ্যা জাল মুখোসের বাইরের রূপ দেখে ভুল করছে ! আজও কত স্বাড়ম্বরে তার জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। সমাজের কত বড় বড় মাথা আজও তার খ্যাতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আজও কাগজে কাগজে তার সভাপতিত্বের আর তার শ্রীমুখ-নিসৃত বাণীর সংবাদ ছাপা হয়। আজও তার জাল করা উপন্যাসের জন্যে তাকে শ্রেষ্ঠ

পুরস্কার দেওয়া হয়, আশ্চর্য্য! সুজন হতবাক্ হয়ে ভাবে এ কেমন করে সম্ভব? কেমন করে সে তার আসল রূপটা সমাজের চোখের সামনে তুলে ধরবে! কেমন করে সকলকে জানিয়ে দেবে সুবিমল অমানুষ, সুবিমল জঘন্য সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত। সুজনকে তো কেউ হঠাৎ বিশ্বাস করবে না, রাগে জ্বলে উঠলো সে। এই মিথ্যা পৃথিবীতে ভণ্ডদের কারবার এখন তো জোর শুরু হয়েছে। সুজন একা, তার কতটা রূপ পাল্টাতে পারে? কেমন করে সে জানিয়ে দিতে পারে সুবিমলের আসল পরিচয়? কেমন করে সম্ভব? মিলার মত আরো কতজনের জীবনে সুবিমল অন্ধকার এনে দিয়েছে কে জানে? কে জানে আরও কত মেয়ে মিলার মত ভুল করে সব কিছু দিয়ে রাস্তায় বসে কাঁদছে! মিলার মত আধুনিকা যদি ভুল করে থাকে, তবে যারা এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিতা নয়, তারা তো ভুল করবেই, ভুল করাটাই স্বাভাবিক। সাহিত্যিকের হৃদয়টা যে সাহিত্যিকের হৃদয় নয়, চোরের হৃদয়, তা বাইরে দেখে সকলে বুঝবে কেমন করে? কেমন করে জানবে যে, যাঁর হৃদয়টা শিল্পীর, তিনি তো সুবিমলের ষড়যন্ত্রে গারদখানায় আটক থেকে উন্মাদ হয়ে গেছেন।

নন্দগোপালের জন্যে সুজনের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। বেচারা বৃদ্ধ সাহিত্যিকের শেষ পরিণতির কথা ভেবে শিউরে উঠলো সে। নন্দগোপালকে এ পৃথিবীর আলোয় আর কোনওদিন ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব হবে? মানুষের মর্যাদায় আবার তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সুজন কি তার সমস্ত জীবন ব্যয় করেও সফল হবে? সুবিমলের মুখোস কি খসে পড়বে? নন্দগোপাল কি জানবে, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি বৃথা যায়নি, তার লেখা ঘরে ঘরে সম্বর্দ্ধিত হচ্ছে; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে তাঁর সৃষ্টি। আবার কি তাঁর জন্মোৎসব এমনি করেই পালিত হবে? পৃথিবী কি নন্দগোপালের আসল পরিচয় জানবে? প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে সুবিমলকে কি আশ্রয় নিতে হবে অমনি একটা গারদখানায়?

সুজন ভাবে এই কটা দিনে এতো ঘটে গেছে। এত পরিবর্তন হয়ে গেছে তার অজান্তে। মিলা কেমন করে এতটা অপমান সহ্য করে আজও বেঁচে আছে চিন্তা করতে পারে না সুজন। কত আঘাত, কত অবিচার হয়েছে মিলার উপর। কত ঝড়-তুফান বহে গেছে মিলার দেহ-মনের উপর দিয়ে। ফুলের মত যে নিষ্পাপ সুন্দর ছিল, সুবিমল তাকে কেমন করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, চিন্তাও করা যায় না। যার জন্যে মিলা তার অতীতকে ভুলেছিল, অতীতের সংস্পর্শ সে এড়িয়ে চলেছিল দিনের পর দিন। তাইতো মিলা সুজনকে দেখে এড়িয়ে চলেছিল, না দেখার ভাণ করে। কিন্তু বেচারা ধরা পড়ে গেল। সুজন যদি মিলার সামনে এসে এমন করে না দাঁড়াতো, তবে সে তো অন্ধকারেই পড়ে থাকতো, জানতে পারতো না মিলার জীবনের সকরুণ ইতিহাস।

—মিলা, শিল্প-সংগঠনীকে মনে পড়ে তোমার? সুজন জিজ্ঞাসা করলো।

কান্নার স্রোত কমে এসেছে! মিলা নিজেকে একটু মুক্ত বলে ভাবছে। উত্তর দিল সে,—ঐ শিল্পই তো আজ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ওকে ভুলবো কেমন করে? ঐ যে দাওয়ায়, ঐ জামাগুলো ওরা সেলাই করে দেয়, ও-গুলোই তো বেচি আমি দোকানে দোকানে; বেশ চলে যাচ্ছে সুজন, কোন অভাবই আমাদের নেই। এই মেয়েটাকে নিয়ে ছোট আমাদের যৌথ সংসার, এখানে চাওয়া আমাদের বেশী নেই, যা আছে তাই নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট; চাওয়াই তো আমার জীবনে অন্ধকার ডেকে এনেছিল, তাই আর চাওয়া নয়, চাওয়ার পালা আমার শেষ হয়ে গেছে।

—মিলা, যার জন্যে তোমায় এত অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হল, লেখক নন্দগোপালকে উন্মাদ হতে হল, তার আসল পরিচয় সমাজে প্রকাশ হয়ে পড়ুক একি তুমি চাও না?

—চাই, কিন্তু করার তাগিদ পাই না।

—বেশ তুমি যদি সম্মতি দাও মিলা, আমি সমাজের সামনে সুবিমলের মুখোস খুলে দেব। যেমন করে সে বৃদ্ধ লেখক নন্দ-গোপালকে গারদখানায় পুরেছে, তেমন করেই তাকেও আশ্রয় নিতে হবে ঐ গারদখানায় অন্ধকারে—যেখানে সে তার অতীত জীবনের কথা চিন্তা করার সময় পাবে প্রচুর। যেখানে বিগত জীবনের সমাজ-বিরোধী কাজের জন্যে অনুতাপ করবে রোজ। আর নামহীন বৃদ্ধ উন্মাদকে সত্যিকার লেখক বলে চিনবে পৃথিবী।

—বেশ তাই কর।

উনিশ

সুজন অনেকদিন পরে আবার সুবিমলের সেই ড্রইংরুমে এসে উপস্থিত হল। আজও এ ঘরটার একটুও পরিবর্তন হয়নি, পিয়ানটা আজও তেমনি আছে, নটরাজের মূর্তিটা ঠিক তেমনি ভাবে সাজান, নগ্ন মুর্ত্তিটা আজও ঘরের কোণে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে ; কেবলমাত্র পরিবর্তন হয়েছে ক্যালেণ্ডারটা।

Pan American Airways-এর লম্বা ক্যালেণ্ডারটা আজ আর তেমন ভাবে ঝোলান নেই ; তার আয়ুটা এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে ; টাঙান আছে নতুন একটা সাধারণ ক্যালেণ্ডার। জানালার ফাঁক থেকে সুবিমলের ফুল বাগানটা আজও দেখা যাচ্ছে, তবে এখন আর এটাকে ফুল বাগান বলা চলে না, সাধারণ একটুকরো জমিতে পরিণত হয়েছে।

সেই পুরাতন চাকরটা আজও এসে দাঁড়াল ; সুজন সুবিমলকে ডেকে দিতে বললো ; চাকর আজও সুজনকে বসতে বলে অন্দরে চলে গেল, দরজার পর্দাটা আজ আবার দুলে উঠলো।

সুজন একটু বসে মনে মনে নানা চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। পরক্ষণেই চিন্তার বোঝা নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো সে, সেই পুরাতন

কোচটা থেকে। মৃদুতালে পা ফেলে এগিয়ে গেল দরজাটার কাছে; পর্দাটা ভাল করে সরিয়ে রাখলো সে।

বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে সুজন তাকিয়ে দেখলো—বৃদ্ধ নন্দ-গোপালের গারদখানার রেলিংগুলোর মধ্যে এক অর্দ্ধ-উলঙ্গ উন্মাদ নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে কয়েক টুক্‌রো কাগজের পাতায় ছোট একটা পেন্সিলের সাহায্যে একমনে লিখে চলেছে, তার কোঠরাগত চোখ দুটো আবছা আলোকে একভাবে তাকিয়ে আছে কাগজ-গুলোর দিকে। নোংরার একটা স্তূপ যেন এই উন্মাদ নন্দগোপালটা, দেহটা শুকিয়ে গেছে একেবারে; চুলগুলোয় জটা ধরেছে, তেল জলের অভাবে; হাতে পায়ে চামড়াগুলো ফেটে ফেটে গেছে, সাদা হয়ে আছে, খড়িতে সারা দেহটা; একমুখ দাড়ি-গোঁফের আড়ালে মুখের বেশীর ভাগ অংশই ঢাকা পড়ে গেছে; আঙুলের নোখগুলো খুব বড় বড়; ময়লাও জমেছে অনেক; ছেঁড়া কাপড়টায় দেহের একটুকরো ঢাকা আছে, এই পর্য্যন্ত। লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে নন্দগোপাল হেসে উঠছে, আবার কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে কেঁদে উঠছে। কান্নার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে ড্রইংরুম পর্যন্ত।

সুজন নন্দগোপালের এ অবস্থা দেখে অভিসম্পাত করছে সুবিমলকে মনে মনে। সে ভাবছে, মানুষ এতখানি নীচ, এতখানি নিষ্ঠুর কেমন করে হতে পারে! যে মানুষ-করে লেখাপড়া শিখিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলো সুবিমলকে, তাকেই এমনি একটু একটু করে মৃত্যুর দ্বারে মানুষ কি করে ঠেলে দেয়; দিনের পর দিন তারই সামনে একটা মহৎ হৃদয় শুকিয়ে শুকিয়ে শেষ হয়ে গেল, সুবিমল তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো কেমন করে?

যতই স্বার্থের সংস্পর্শ থাক; এমন করে কি কাউকে তিলে তিলে শেষ করে দেওয়া কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব? নন্দগোপালকে যতই দেখছে সুজন, ততই তার কান্নায় বুকটা ভরে উঠছে, তবুও সংযত হয়ে রয়েছে সে। অনেক বড় দায়িত্ব সে মাথায় করে

নিয়েছে। মিলাকে কথা দিয়েছে সুবিমলের আসল পরিচয় সকলের সামনে সে তুলে ধরবে—সে যেমন করেই হোক। এ কাজ তাকে সমাধা করতেই হবে। সুজন দেখে, নন্দগোপাল লেখার ফাঁকে ফাঁকে কি সব বলে চলেছে ক্ষীণ কণ্ঠে। অনেকক্ষণ সুজন কানপেতে নন্দগোপালের বলা কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করলো, কিছুই বুঝতে পারলো না সে নন্দগোপালের কথার অর্থ। নন্দ-গোপালের ক্ষীণ কণ্ঠের কোনও ভাষা স্পষ্ট উচ্চারিত হয়ে ড্রইংরুমের কাছে এসে পৌঁছল না। নন্দগোপাল এতক্ষণেও কোনও দিকে দৃষ্টিপাত করলো না, একবার ড্রইংরুমটার দিকে চেয়ে দেখলো; বন্ধ গরাদগুলোকে একটু ফাঁক করতে চেষ্টা করলো না। বাহ্যিক কোনও চেতনা তার ছিল না; সমস্ত চেতনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ঐ ছেঁড়া কাগজগুলোর উপর। নন্দগোপাল লিখে চলেছে কি তা কেউ জানে না। নন্দগোপাল নিজেও হয়ত বলতে পারবে না, সে কি লিখে চলেছে; হয়তো নন্দগোপাল নিজে জানলেও প্রকাশ করতে পারবে না। প্রকাশ করার ক্ষমতা হয়তো তার শেষ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরেই দরজার তালা খোলার শব্দ হল। নন্দগোপালের সঙ্গে সুজন দরজার দিকে চেয়ে দেখলো,—চাকর নন্দগোপালের জন্যে খাবার দিয়ে গেল একটা কলাইএর থালায়। ক্ষুধার্ত নন্দ-গোপাল গোগ্রাসে খেতে শুরু করে দিল। সুজন তার জীবনে এমন করে কাউকে খিদের জ্বালায় খেতে দেখেনি। এবার তার চোখের কোণে জল জমা হয়ে উঠলো, আর সহ্য করতে পারছিল না সে; তবুও তাকে সয়ে যেতে হল হতবাক্ হয়ে। নন্দগোপালের খাওয়া তখনও চলেছে, কাগজগুলোর দিকে তখন আর তার কোনও নজর নেই। চাকরটা ধীরে ধীরে আবার ঘরে প্রবেশ করলো—আরও নতুন কতকগুলো কাগজ সঙ্গে নিয়ে; সেগুলো রেখে গারদখানাটা একটু ঝাড়ু দিয়ে সমস্ত জঞ্জাল রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এলো।

এত সহজে যে সুজন ঐ ছেঁড়া কাগজগুলো সংগ্রহ করতে পারবে, সে ভাবতেও পারেনি। জানালার ফাঁক থেকে ডাস্টবিনটা দেখে রাখলো সে। আবার এসে কোচে বসল পরম মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যে। নন্দগোপালের দরজায় তখন আবার সেই পুরাতন তালাটা ঝুলতে শুরু করেছে। নন্দগোপাল আবার লিখে চলেছে, সেই একইভাবে। যেমনভাবে লিখতে দেখেছিল সুজন পর্দাটা সরিয়েই; ঠিক সেইভাবেই নন্দগোপাল আবার লিখে চললো পাতার পর পাতা।

আজও সুবিমল ঠিক তেমনি ভাবেই একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঘরে প্রবেশ করলো। আসার সময় পর্দাটা ভাল করে ফেলে দিয়ে একবার চাকরটাকে খুঁজলো মনে মনে; তারপর সুজনকে দেখে নমস্কার করে একটা কোচে বসে পড়েই বলে উঠলো,—অনেকদিন দেখিনি আপনাকে, কেমন ভাল আছেন তো? তারপর মিলা দেবীর কোনও সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলেন? না আজও ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

—আমি ভাল আছি; আপনি?

—এই এমনি কেটে যাচ্ছে; মন্দ নেই।

—মিলার কথা বলছিলেন? কি হবে আর সন্ধান করে? যে যাবার তাকে তো আর কেউ আটকে রাখতে পারবে না।

—এই যা বলেছেন! একটা কথার মত কথা। এককালে মেয়েটি আসতো, আপনাদের সংগঠনীর জন্যে, তখন মনে রাখতাম, এখন আর আসে না, তাই একেবারেই ভুলে গেছি; কত আর মনে রাখা যায় বলুন না? তারপর এখন থাকেন কোথায়, নিশ্চয় এ-পাড়ায় আর থাকা হয় না? থাকলে দেখা হতো মাঝে মাঝে।

—না, নর্থে একটা বাড়ী ভাড়া করে আছি।

—তা বেশ করেছেন। তবে হঠাৎ আবার কি মনে করে এ পাড়ায়?

সুবিমলকে আজ অনেক শান্ত অনেক ভদ্র লাগল সুজনের, কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে তার চেহারায়, মুখের রুক্ষতা আবার বেশ খানিকটা কমে গেছে। কমনীয়তা বেড়েছে খানিকটা; ব্যবহারে বেশ একটু দরদ মেশান আছে। কেন? তা সুজন বুঝতে পারলো না, আর বুঝতে চেষ্টাও করলো না; কারণ অত করে আর বোঝার ইচ্ছে সুজনের নেই। তার যা পরিচয় সে মিলার কাছে পেয়েছে, আর যে অবস্থা নন্দগোপালের দেখেছে, তাই যথেষ্ট, আর নতুন করে সুবিমলকে চিনবার প্রয়োজন নেই সুজনের। বাইরেটা দেখে আর চট করে কাউকে বিশ্বাস করবে না সে। সুবিমলের দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল সুজন, এবার জবাব দিল,—হঠাৎই এসেছি,—কিছু মনে করে নয়, থাকতে পারলাম না বলেই আসা; কদিন ধরে আপনার নতুন উপন্যাসখানা পড়ছিলাম; এত ভাল লাগলো যে আপনাকে এই ভাললাগার খবরটা না জানিয়ে পারলাম না। সত্যিই বলছি খুব ভাল লেগেছে।

—ও তাই বলুন, আমি ভেবেছি, অন্য কোনও দরকার হয়তো আপনার রয়েছে এ পাড়ায়; তা নয়, আজ একান্ত আমার কাছেই এসেছেন, আমার উপন্যাস আপনার ভাল লাগার জন্যে ধন্যবাদ।

সুবিমলের মুখটা একবার দীপ্ত হয়ে উঠলো, সে যে খুব খুশী হয়েছে তা তার কথা বলার ভাব ভঙ্গী দেখেই সুজন বুঝল। কথা বলার ফাঁকে চাকরটা একবার ঢুকতেই সুবিমল চাকরকে সুজনের জন্যে খাবার আর চা পাঠিয়ে দিতে হুকুম করে দিলো। সুজন বাধা দিল, সুজনের বাধা সুবিমল শুনলো না কিছুতেই।

ওষুধে কাজ হয়েছে দেখে সুজন আরও বলে চল্‌লো,—সমাজের নীচুস্তরের মানুষদের নিয়ে এমন দরদ-মেশান লেখা এর আগে বাংলার আর কোনও সাহিত্যিক লিখে যাননি; সামান্য একটা চাকর; ডকের দুটো কুলি, তাদের জীবনী নিয়ে যে এত সুন্দর করে কিছু লেখা যায়, তা আমি কোনওদিন কল্পনাও করতে পারিনি।

এদের জীবনেও যে এত ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে ; আবার তাও আমাদের জীবনের সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, তা আপনার এই শেষ উপন্যাস খানা না পড়লে জানার উপায় নেই। সার্থক আপনার প্রচেষ্টা, আরও লিখে যান, সাধনা আপনার সফল হোক, ঈশ্বরের কাছে এ-কামনা করছি, আর বার বার অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে।

সুবিমলের আনন্দ আর ধরে না, বার বার হাসিতে মুখটা ভরে উঠছে ; বারবার ধন্যবাদ দিচ্ছে সুজনকে।

সুবিমলের চাকর চায়ের সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে এসে সুজনের সামনে রাখলো।

সুজন বললো,—এর কোনও দরকার ছিল না।

— তা কি হয়, আপনি আমার অতিথি।

সুজন ভাবলো অতিথিতো সে এর আগেও হয়েছে অনেকবার, তখনতো একগ্লাস জলও জোটেনি সুজনের ভাগ্যে। এমনি হয়, পৃথিবীটাই এমনি, মিথ্যার আশ্রয়ে গেলে সবই জোটে, আবার সত্য পদদলিত হয় বারে বারে। নন্দগোপালের কথা আবার সুজনের মনে পড়ে গেল।

খাওয়ায় প্রবৃত্তি ছিলনা তার, তবুও খেতে হল সুজনকে। তার সমস্ত কাজই পড়ে আছে এখনও। কতবার আরও আসতে হবে এখানে, কে জানে। সদ্‌ভাব তো শেষ হবে একদিন, এত দ্রুত তা করে লাভ কি ?

সুবিমলের একটা দুর্বলতা আজ সুজন সংগ্রহ করলো এখান থেকে ; তার প্রশংসা করে অনেককিছু তার কাছ থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

—আবার দেখা হবে, আজ আসি।

—নমস্কার।

সুজন প্রতিনমস্কার করে সুবিমলের বাড়ীর বাইরে চলে এলো।

সুজন রাস্তায় এসে সুবিমলের বাড়ীটার দিকে একবার দেখে

নিলো; কেউ নেই; কেউ দেখছে না তাকে। সুজন প্রথমেই রাস্তার ডাস্টবিনটা ঘাঁটতে শুরু করলো। নন্দগোপালের লেখা বিক্ষিপ্ত কাগজের ছেঁড়া টুকরোগুলো সঞ্চয় করে নিজের কাছে জমা করে রাখলো। পরে রাস্তায় যেতে যেতে সেগুলো বারবার পড়ে দেখতে চেষ্টা করলো সে, কিছুই বুঝলো না, ছন্নছাড়া কয়েকটা বর্ণমাত্র তার চোখে পড়লো।

সুজনের বন্ধু ছিল অনেক জায়গায় ছড়ান; প্রথমেই সে গেল পুলিশ অফিসারের কাছে, যার সঙ্গে সুজন স্কুলের শেষ সীমাটা পর্যন্ত একসঙ্গে কাটিয়েছে, সেই দীপক গাঙ্গুলীর কাছে।

হঠাৎ সুজনকে দেখে দীপক প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেল, পরে ধীরে ধীরে সবই পরিষ্কার হয়ে গেল সুজনের এ হঠাৎ আসবার কারণ কি জেনে।

দীপকই সুজনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল একজন **Handwriting Expart**-এর কাছে; তাঁর সঙ্গে আলোচনা হল বাকী দিনটা।

সন্ধ্যে হয়ে এলো, পশ্চিম আকাশের কোলে ধীরে ধীরে লাল সূর্য ঢলে পড়লো। অন্ধকার নেমে এলো কলকাতার পথে ঘাটে। আবার আলোর মালা জ্বলে উঠলো একটু একটু করে সারা শহরটায়। তিন বন্ধু আজ নতুন কাজে প্রেরণা পেয়ে এগিয়ে চললো, তাদের আগামী কাজে। প্রকাশকের দুয়ারে গিয়ে তিনজনেই উপস্থিত হল; প্রকাশক শিশিরকুমার গাঙ্গুলী সকলকে বসতে অনুরোধ করে সবই শুনে গেলেন। মুখটা তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো একটু একটু করে। স্তম্ভিত হয়ে তিনি সুবিমল রায়ের কথা ভাবতে লাগলেন। সবই যেন স্বপ্নেরও অতীত বলে তাঁর মনে হল। দীপকবাবুর উপদেশে তিনি বুঝলেন, তার নিজের কোনও বিপদের সম্ভাবনা এতে নেই। সবই এখন গোপন থাকবে, প্রকাশক এ প্রতিশ্রুতি দিলে শিশিরবাবু সমেত সবাই এসে প্রেসে উপস্থিত হল।

প্রেসের ম্যানেজার অনেক পুরোন ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে সুবিমলের

উপন্যাসের সমস্ত জীর্ণ, দীর্ণ প্রেস কপি, সুজনের হাতে তুলে দিলেন সুজন প্রাপ্তি স্বীকার করে একটা কাগজে লিখে দিয়ে আবার চলতে শুরু করলো।

রাত তখন অনেক হয়ে গেছে, সকলকে বিদায় দিয়ে সুজন আবার চলা শুরু করলো,—মিলার ছোট্ট ঘরটির দিকে। সেখানে তাকে রোজ একবার অন্ততঃ উপস্থিত হতে হয়, মিলার তাগিদে। সুজনও মিলার তাগিদ রক্ষা করেই চলে।

কুড়ি

কয়েকদিনের মধ্যেই সুজন, সুবিমলের বিরুদ্ধে উপন্যাস জালের মামলা শুরু করে দিল। মামলা দায়ের করার পূর্বে সুজনকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হল সর্বক্ষণ।

ম্যাজিস্ট্রেট সুজনের অভিযোগ গ্রহণ করার পূর্বে আঞ্চলিক থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে সমস্ত ঘটনার অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দিলেন।

সুজনের সুহৃদ দীপক গাঙ্গুলী হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টকে সঙ্গে নিয়ে সুজনের সহযোগিতায় ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে সমস্ত ঘটনা বুঝিয়ে দিলো।

অফিসারটি সুজনকে অভিনন্দন জানাল বারবার। সমাজের সামনে এইসব দুর্বৃত্তদের আসল স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়ার জন্যে সুজনের এই মহৎ প্রচেষ্টায় সন্তোষ প্রকাশ করলো সে। এতবড় একটা প্রতিভা এইভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দুঃখিত হল অফিসার। প্রতিশ্রুতি দিল সুজনকে সাহায্য করায় কোনও কুণ্ঠা সে প্রকাশ করবে না।

স্পেশাল এঙ্কোয়ারি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল, ভারপ্রাপ্ত অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাখিল করলো, সমস্ত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। সমস্ত রিপোর্টটা পড়ে ম্যাজিস্ট্রেট স্তম্ভিত হলেন। আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন তিনি—কত অদ্ভুত ঘটনাই না একটার পর একটা ঘটে চলেছে এই মহানগরীর বুকে, মুক্ত আলোয়।

সুবিমল মনে মনে অভিসম্পাত করতে লাগলো সুজনকে। মিথ্যার জাল ফেলে সেদিন সে কেমন করে নন্দগোপালের হাতের লেখা সঞ্চয় করেছিল, কেমন করে নন্দগোপালের সমস্ত অবস্থাটা সে নিজে চোখে দেখে গেল, সুবিমলের বুঝতে আর বাকী রইল না। তার জীবনের গোপন কাহিনী যে মিলা ছাড়া আর কেউ জানে না সুবিমল তা বুঝল, ভাবলো মিলাই তার সর্বনাশের পথ সুজনকে দিয়ে এমনি করেই পরিষ্কার করে দিচ্ছে। সুবিমল যে এই কেসে সম্পূর্ণভাবেই জিতে যাবে, তা উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করেই সে বুঝলো। এরপর সুজনের নামে মানহানীর মামলা করে কেমন করে তাকে পথে বসাতে হবে, তারই চিন্তায় সে মাঝে মাঝে বিভোর হয়ে উঠলো। তবু সংশয় যায় না, তবু ভয় হয় সুবিমলের—যদি একটু একটু করে সমস্তই সুজনের দিকে চলে যায়, যদি এই জীবন-মৃত্যুর সমস্যায় সুবিমলকে পরাজয় মেনে নিতে হয়? তবে? সুবিমল আতঙ্কে কেঁপে উঠলো কয়েকবার। এতদিনের তিল-তিল করে গড়ে তোলা সম্মান সবই কি ধূলায় লুটাবে? নন্দগোপালের মত ঐ অন্ধকার গারদখানায় কি তাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একটু একটু করে শুকিয়ে মরতে হবে? অসম্ভব! আবার উকিলকে ডেকে পাঠাল সে; উকিল গম্ভীর হয়ে উপদেশ দিল সুবিমলকে; ছাপার অক্ষরে যতগুলো উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, সবগুলোই সুবিমলকে কয়েক-দিনের মধ্যে নকল করে ফেলতে হবে।

উপন্যাস নকল করা চল্‌ল, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। লিখতে লিখতে রাগে, ক্ষোভে, সুবিমল নন্দগোপালের মৃত্যুকামনা করলো মনে মনে। সুবিমল ভাবলো, এতো লিখেছে কেমন করে? একটা মানুষ সারা জীবনে এত পাতার পর পাতা কেমন করে লিখে যেতে পারে, সুবিমল বুঝতে পারে না। নন্দগোপাল তো এগুলো না লিখলেই পারতো। মিলা আর সুজন তার এ সর্বনাশ করার আগে একবার জানাতেও পারতো? মানুষ মানুষের এমন করে

সর্বনাশ করে কি করে? সুবিমল নিজের কৃতকর্মের কথাও ভাবে মাঝে মাঝে।

কটাদিনের মধ্যে সুবিমলের চেহারার খুব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। বিনিদ্র রজনী তার পার হয়ে গেল অনেকগুলো। লিখে চলেছে সুবিমল—পাতার পর পাতা লিখে চলেছে সে সমস্তক্ষণ আত্মীয়তা ভদ্রতা সে ভুলে গেছে এ কটাদিন—প্রাণের তাগিদে, বাঁচার দায়ে।

সুবিমলকে চিনতে পারা কঠিন হয়ে উঠলো ধীরে ধীরে।

তারপর একদিন আদালতে কেসের দিন পড়লো; সুজন উপস্থিত হল সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে; হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট-এর সঙ্গে দীপকও সেদিন উপস্থিত হল কোর্টে। কিন্তু সুবিমল হল অনুপস্থিত, তার পক্ষের উকিল জানাল, অসুস্থতার জন্যে সুবিমল আজ উপস্থিত থাকতে পারবে না।

এমনি করেই কয়েকটাদিন সুজনের বৃথাই আদালতে হাজির দেওয়া চল্‌ল; মামলা জমে উঠলো না।

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল, আজ সুবিমল উপন্যাসের সমস্ত পাণ্ডুলিপি কোর্টে জমা দিয়ে কাটগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে গেল—লেখা আমার হবি তাই লিখে যাই, ছেলেবেলায় অমৃতসরে যখন আমার কেটেছে, তখন থেকেই লেখার সাধনা আমার চলে এসেছে, আজও চলছে। এত অল্পদিনের মধ্যে এত উপন্যাস আর কোনও লেখক লিখেছেন বলে আমার মনে হয় না। লেখাতে আমার সত্যিই খুব আনন্দ ছিল; লিখে যেতুম আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। নন্দগোপালবাবু আমার জ্যাঠামশাই হন; আমার উপন্যাসের press copy তিনিই করে দিতেন; এত লিখে আবার press copy করার মত আমার সময় ও ধৈর্য্য দুই-ই ছিল না; সুজনবাবুর উকিল যে বলেছেন প্রেসের কপিগুলো নন্দগোপাল রায়ের লেখা, তাতে আমিও একমত; উনিই ওগুলো লিখে দিয়েছিলেন।

হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টের সঙ্গে সুবিমলের কথা একেবারে মিলে গেল, প্রমাণ হয়ে গেল, বর্তমান কাগজের টুকরোগুলো, যেগুলো উন্মাদ নন্দগোপাল আজও লিখে চলেছেন, তা-আর প্রেসের কপিগুলো একই ব্যক্তির হাতের লেখা, সে ব্যক্তি আর কেউই নয় বৃদ্ধ নন্দগোপাল রায়।

সুবিমল কোর্টে জমা দেওয়া পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে বললো,—আপনি যে পাণ্ডুলিপির কথা বলছিলেন এই সেই পাণ্ডুলিপি—যা আমি বহুদিন ধরে লিখে এসেছি· আর অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করে চলেছি।

হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট সুবিমলের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বল্‌লেন,—আপনার হাতে যে পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যা নন্দগোপাল রায়ের পাণ্ডুলিপি বলে প্রমাণিত হল, তা প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার লেখা ; আর এই পাণ্ডুলিপি দেখুন, যে পাণ্ডুলিপির কথা সুবিমলবাবু বলছেন—তাঁর লেখা, তা কয়েক-সপ্তাহের মধ্যেই লেখা হয়েছে ; আপনি হাতে নিলেই বুঝবেন এ লেখা কতদিনের।

ম্যাজিস্ট্রেট দুটি পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখলেন অনেকক্ষণ ; আবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি সুবিমলকে,—আপনি যে পাণ্ডুলিপি কোর্টে জমা দিয়েছেন সেগুলোই কি প্রথমে লেখা হয়েছে ? আপনার কাছে আর কোনও পাণ্ডুলিপি আছে কি ?

সুবিমল উত্তর দিলো,—না. আর কোনও পাণ্ডুলিপি আমার কাছে নেই ; আমি যেগুলো দিয়েছি সেগুলোই প্রথমে লেখা হয়েছিল। তবে যত্ন করে রাখার জন্যে আজও ওগুলো পরিষ্কার আছে। আর press copy ধুলোয় অপরিষ্কার, তাই পুরাতন বলে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক।

প্রকাশক শিশিরকুমার গাঙ্গুলী উঠে দাঁড়িয়ে জেবার উত্তরে বললেন,—এক বছর আগে নন্দগোপালবাবু যখন আমার কাছে, সুবিমল রায়ের ঠিকানা নিতে এসেছিলেন তখনও তিনি উন্মাদ

হননি ; তিনিই তখন একটামাত্র কথা বলেছিলেন স্নুবিমলবাবুর সম্পর্কে যা আজও আমার মনে আছে। আমি যখন বললাম তিনি কাউকে ঠিকানা দিতে চান না, কারণ, আমার মনে হয় এতে তাঁর লেখার ব্যাঘাত হয়। তখন তিনি রেগে বলে উঠলেন,—সব ধাপ্পা-বাজী। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম,—কি বলছেন? তিনি বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিকই বলছি! আমি তাকে চিনি না ছেলের মত মানুষ করলুম? সেদিন একটু হেসেছিলুম, ঠিকানাটা দিয়েছিলুম; আর কোনও কথা হয়নি। প্রায় এক বছর তাঁর আর কোনও সংবাদ পাইনি। খবর নেয়াও দরকার মনে করিনি। আজ মনে হচ্ছে নন্দগোপালবাবু ঠিকই বলেছিলেন।

এমনি করেই কোর্টে জেরার পর জেরা চলতে লাগল, উকিলদের আইনের মারপ্যাচ্ চল্‌লো কয়েকদিন; শেষে রায়ও একদিন বের হয়ে গেল: ম্যাজিস্ট্রেট বহু পুরাতন কাগজের লেখার সঙ্গে স্নুবিমলের বর্তমান লেখার মধ্যে বহুদিনের পার্থক্য দেখিয়ে স্নুবিমলকে উপন্যাস জাল, আর এরই জন্যে নন্দগোপালের উন্মাদ হওয়া সমর্থন করে স্নুবিমলকে অভিযুক্ত করলেন!

স্নুবিমলের জেল হয়ে গেল।

প্রত্যেকটা দৈনিকে সেদিন এই সংবাদ প্রকাশিত হল সাড়ম্বরে, প্রত্যেকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্নুবিমলের এই জঘন্য মনোবৃত্তির কথা উল্লেখ করা হল।

অনুতাপ করা হল উন্মাদ নন্দগোপাল রায়ের এই সাংঘাতিক পরিণতির কথা উল্লেখ করে। বহু লেখকের অভিনন্দন প্রকাশিত হল নন্দগোপালের উদ্দেশ্যে কাগজে কাগজে। নন্দগোপালের ছবি প্রকাশিত হল দৈনিকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

সাধারণের সমাগম শুরু হয়ে গেল স্নুবিমলের অভিশপ্ত বাড়ীতে; যেখানে নন্দগোপাল এসে বন্দী হয়েছিল অন্ধকার গারদখানায়।

আজ নন্দগোপালকে জোর করে বার করা হয়েছে ; বহুদিন পরে নন্দগোপাল স্নান করেছে, বহুকাল পরে নন্দগোপাল নতুন ধুতি পরেছে।

কিন্তু যার জন্যে এতো সেই নন্দগোপাল বিস্ময়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে থাকে ; এতকাণ্ড কেন, সে কিছুই বুঝতে পারে না, সমস্ত বোঝা বুঝির বাইরে সে।

শ্রদ্ধায় সবাই উন্মাদ নন্দগোপালকে মালা দিয়ে যায়, নন্দগোপাল মালাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে জমা করে রাখে পাশে। মাঝে মাঝে লেখার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, সুজন গিয়ে কয়েকটা কাগজের টুকরো তার হাতে তুলে দেয়। নন্দগোপাল লিখে চলে ; লেখার সময় আর কোনও বাহ্যজ্ঞান তার থাকে না, বারবার ডাকলেও সে সাড়া দেয় না, ফুলের মালা ছিঁড়ে ছিঁড়ে আর জমা করে রাখে না, পাশটিতে।

নন্দগোপালকে দেখে চোখের জল ফেলে অনেকেই ; অনুতাপ করে মনে মনে ; ভাবে, নন্দগোপাল সুস্থ থাকলে দেশকে আরও অনেককিছু দিয়ে যেতে পারতো। সুবিমলকে অভিসম্পাত দেয় বহুজনেই। তাকেও দেখতে যায় অনেকেই জেল-খানায়, গারদ-খানার মাঝে। সুবিমল লজ্জায় মুখ ঢাকে।

কিছুদিনের মধ্যেই নন্দগোপালের সম্বর্ধনাসভার আয়োজন হ'ল সাড়ম্বরে।

নন্দগোপালের এই সম্বর্ধনাসভায় মহানগরীর বহুজনই উপস্থিত হল। লেখকই শুধু এখানে ছিলো না, যারা কোনওদিন লেখেনি, যারা নন্দগোপালের কোনও লেখা কোনওদিন পড়েনি, তারাও উপস্থিত হয়েছিল, নন্দগোপালকে দেখার জন্যে। দেখার এ অদম্য ইচ্ছা সাধারণের মনে আকুল হয়ে জেগে উঠেছিল ; অভিনব, অদ্ভুত লেগেছিল নন্দগোপালের জীবনটা। একজন লেখককে কত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নন্দগোপাল রায় ; যার জন্যে শেষ পর্যন্ত তাকে উন্মাদ হতে হল।

সুবিমলকে ঘৃণা করে সকলে, এই সভাতেও সে ঘৃণা ফুটে উঠলো একটু একটু করে। সুবিমলের মুখোসটা খুলে ধরার জন্যে সভা সুজনকে

অজস্র অভিনন্দন জানাল। এতবড় একটা কঠিন কাজ সমাধা করার জন্যে সুজনকে কেন্দ্র করে সভার মধ্যে একটা গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল। সুজন এই অভিনন্দন পাওয়ার একটা অংশ মিলাকে দেওয়ার জন্যে মিলাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো, কিন্তু মিলাকে পেল না সে।

কিছুক্ষণ পরে মিলা এসে নন্দগোপালের লেখা প্রকাশিত সবগুলি উপন্যাস নন্দগোপালের হাতে তুলে দিল। উন্মাদ নন্দগোপাল উপন্যাসগুলো একবার ভাল করে দেখে আবার সরিয়ে রাখলো দূরে। আর কোনও আকর্ষণ দেখা গেল না তার, ঐ প্রকাশিত উপন্যাস গুলোর জন্যে। কয়েক টুকরো কাগজ নিয়ে সে আপন মনে লিখে চল্‌ল; এত বড় সভা, সে যেন এর কেউ নয়; সে যেন এই জাগতিক সমস্ত কিছুর বাইরে। একা!

সভা শেষ হয়ে গেল।

নন্দগোপালের চিকিৎসার ব্যবস্থা চললো জোর তালে, প্রায় সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল, নামকরা কোনও চিকিৎসকই আর নন্দ-গোপালকে দেখতে বাকী রাখলো না। সকলের যৌথ চেষ্টা চললো ভালভাবে; সেবার ভার নিয়েছিল নন্দগোপালের পরম আত্মীয় সুজন আর মিলা।

সেবার সঙ্গে চললো উপযুক্ত চিকিৎসা। কিন্তু কোনও আশার আলো দেখা দিল না, ডাক্তারেরা কোনও আশার বাণী দেশকে শোনাবার সৌভাগ্য লাভ করলো না।

নন্দগোপালের কোনও পরিবর্তন হল না, হওয়ার লক্ষণও দেখা গেল না।

নন্দগোপালের লেখা আজও চলেছে একইভাবে।

একুশ

নন্দগোপালের চিকিৎসা আবার নতুন ধারায় চলতে লাগলো। ভিয়েনা থেকে একজন চিকিৎসক এসেছিলেন কয়েকদিনের জন্য এই কলকাতায়। নন্দগোপালকে সুস্থ করে তোলার ভার পড়ল তাঁর উপর।

নানাভাবে চিকিৎসা চললো এই বিদেশী চিকিৎসকের ; দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তিনি নিজে উপস্থিত থেকে নন্দগোপালকে লক্ষ্য করে চলেছেন। সকলেই আশান্বিত হয়ে উঠলো, এবার হয়তো কিছুটা ফল পাওয়া যাবে। সকলেই অপেক্ষা করে রইল কোনও ভাল কিছু শোনার আশায়।

কয়েকদিন পরেই চিকিৎসক জানালেন,—এঁকে ভাল করতে সময় লাগবে অনেক, শেষে যে ইনি ভাল হয়ে উঠবেন, এমন কোনও আশা তিনি দিতে পারেন না।

দু-জন চিকিৎসককে নন্দগোপালকে চিকিৎসা করার পদ্ধতি ভাল করে বুঝিয়েদিলেন তিনি, আর এখানের চিকিৎসকদের প্রশংসা করলেন, চিকিৎসার পদ্ধতি দেখে।

আগন্তুক ডাক্তার আবার ভিয়েনায় ফিরে গেলেন।

সকলেই যে নতুন আশার আলো এতক্ষণ দেখেছিল, তা ব্যর্থ হল প্রথম পর্যায় ; মর্মাহত হল অনেকেই বিশেষ করে সুজন আর মিলা।

আবার নতুন আশায় বুক বাঁধল তারা, প্রতীক্ষা করে রইল, আগামী শুভদিনের জন্যে।

বিদেশী ডাক্তারের চলে যাওয়ার পর সুজন একটু সময় পেল। কলেজস্কোয়ারে প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করতে গেল সে।

শিশিরবাবু অনেকদিন পরে সুজনকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন ; পুরাতন পদ্ধতিতে বাসদেওকে এক কাপ চা আনতে হুকুম দিলেন। একটু পরেই বাসদেও চা নিয়ে হাজির হল।

সুজন চায়ের পেয়ালাটায় মুখ দিল।

শিশিরবাবু নন্দগোপাল রায়ের দু-সেট বই এনে সুজনকে দিয়ে বললেন, একসেট আপনার, আর বাকীটা মিলাদেবীর। আমার এই সামান্য উপহার আপনাদের গ্রহণ করতেই হবে।

সুজন দেখল নন্দগোপালের উপন্যাসগুলোয় নতুন করে প্রচ্ছদপট ছাপা হয়েছে, সুবিমল রায়ের নাম মুছে গেছে উপন্যাসের পাতা থেকে।

সুজন ভাবলো, নন্দগোপাল অমর হয়ে রইল, তার লেখার মধ্যে, বাংলাদেশের মানুষের মনের মণিকোঠায়। আর সুবিমল? সুবিমল ধীরে ধীরে কেমন করে মিলিয়ে যাচ্ছে মানুষের মন থেকে; তাকে আর কেউ মনে রাখতে চায় না; চায়না আজও সে বেঁচে আছে এ সংবাদটা শুনতে।

ঔপন্যাসিক নন্দগোপাল উন্মাদ হওয়ার পূর্বেই বাঙ্গালীর মন জয় করে নিয়েছে; তবে তখন এ বইগুলোর সঙ্গে জড়ান ছিল নিষ্ঠুর সুবিমল রায়। আজ আর তা নেই, আজ নন্দগোপাল একাই সমস্ত সম্মানের অধিকারী। নন্দগোপাল একথা না জানলেও সবাই জানে এ-কথাগুলো। সে মুক্তি পেয়েছে সুবিমলের কারাগার থেকে; কিন্তু মুক্ত সে আজও হয়নি; তার পূর্বস্মৃতি আজও মুক্ত হয়ে যায়নি তার নিজের কাছে।

বর্তমানকে নিয়েই নন্দগোপাল আজও ব্যস্ত, সে লিখে যায় আজও, কিন্তু কি লিখে তা কেউ জানে না, জানতে পারে না। অনেকে কল্পনা করে সুবিমল সব-ই কেড়ে নেওয়ার পর আবার নন্দ-গোপালের উপন্যাস লেখা শুরু হয়েছে মনে মনে। এ লেখার শেষ কবে হবে কেউই জানে না; আবার নতুন লেখা শুরু হবে কবে কেউ বলতে পারে না, তার-ই প্রতীক্ষায় থাকে সবাই। নন্দ-গোপালের উপন্যাসগুলো হাতে নিয়ে সুজন ভাবে, কবে নন্দগোপাল এগুলো নিজের বলে চিনে নেবে? কবে সে বুঝবে তার এত সাধনা বৃথা যায়নি; সাধারণ মানুষ আসলকে ঠিক চিনে নিয়েছে, নকলকে ময়লা কাগজের মত ফেলে দিয়েছে রাস্তার পাশের আস্তাকুড়ে— যেমন করে প্রথম যৌবনে সুবিমল মিলাকে ফেলে দিয়েছিল। সে আরও ভাবে নন্দগোপালকে অতীতের দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া আর তার প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছে তা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাদেরই। এ দায়িত্ব কি তারা সার্থক করে তুলতে পারবে? পারবে কি নন্দগোপালকে আবার ফিরিয়ে আনতে?

শিশিরবাবু বললেন,—সুবিমলবাবু জেলে যাওয়ার পর নন্দ-

গোপালবাবুর বই-এর বিক্রী অসম্ভব বেড়ে গেছে। মনুষ্যত্বের কথা বাদ দিয়ে যদি ব্যবসার কথাই বলা যায়, তাও আপনার জন্যে সার্থক হয়ে উঠেছে। একমাত্র নন্দগোপালবাবুর উপন্যাসের নতুন নতুন সংস্করণ ছাপাতেই আমার প্রেস সবসময়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে ; অন্য বই প্রকাশ করার কোনও প্রয়োজন বর্তমানে আমাদের আর নেই। এর জন্যে আরও একজনকে আজও আমার মনে পড়ে, তিনি প্রফেসার মিঃ সেন। তিনিই প্রথম সুবিমলবাবুকে সঙ্গে এনে এই উপন্যাস-গুলো প্রকাশ করার জন্যে আমায় অনুরোধ করেছিলেন। তিনিও জানতেন না, এ বইগুলোর লেখক আসলে সুবিমল রায় নয়, নন্দগোপাল রায়। তাঁরও সন্ধান অনেকদিন পাইনি, জানি না তিনি কেমন আছেন? তাঁর নতুন বাসার ঠিকানা আমি জানি না, তিনি এখানে আছেন কিনা তাও জানা সম্ভব হয়নি ; তিনি সুস্থ হয়ে কলকাতায় থাকলে একবার আসতেন নিশ্চয়-ই। এতকাণ্ড হয়ে গেল আর তিনি একটা খবরও রাখেন না, একি সম্ভব? তবে নন্দগোপালবাবুর বইগুলোর বিক্রী বেড়ে যাওয়ার ফলে, তাঁর চিকিৎসার অনেক সুবিধে হয়ে গেল।

—নন্দগোপালবাবুকে ফিরিয়ে আনার জন্যে আপনারও ত্যাগ যথেষ্ট শিশিরবাবু। ধন্যবাদ দিয়ে আর আপনাকে ছোট করতে চাই না।

—এটা তো আমার কর্তব্য সুজনবাবু। মানুষ হয়ে এটুকু না করে থাকি কি করে?

—অনেক মানুষই এটুকুও করে না, বরং সুবিমলবাবুর মত সর্বনাশের ব্যবস্থা পাকা করে তোলে।

…এদের মানুষ বলি কেমন করে? দু'টো হাত আর দুটো পা থাকলেই তো মানুষ হওয়া যায় না।

—আজ আসি, নমস্কার।

—নমস্কার, আবার আসবেন।

—নিশ্চয়ই ; অর্থের প্রয়োজন পড়লেই তো এখানে আসতে হবে।

—প্রয়োজন না থাকলে কি আসতে নেই ?

—নিশ্চয় আসব। আচ্ছা।

সুজন নন্দগোপালের উপন্যাসগুলো সঙ্গে নিয়ে চলতে শুরু করলো ; ভাবলো, কাজের চাপে এতদিন তো কারও সঙ্গে দেখা করা হয়নি, দীপকের সঙ্গে একটু দেখা করা একান্ত দরকার। অসময়ে সেইতো আলো দেখিয়ে পথ চিনিয়ে দিয়েছে। অযাচিতভাবে সাহায্য করেছে একের পর এক সে না থাকলে এতবড় একটা কাজ তার একার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠতো না, নন্দগোপালের বাহ্যিক যুক্তি ঘটতো না কিছুতেই। মনে মনে সুজন আবার অভি-নন্দন জানাল দীপককে।

বহুদিন পরে আজ দীপক গাঙ্গুলীর সঙ্গে সুজনের দেখা হয়ে গেল। সুজনকে দেখে দীপক বলে উঠলো,—কিরে, এতদিন পরে ধন্যবাদটা দিতে এলি নাকি ?

—না ভাই, মনে মনে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছি, ওটা আর মুখে প্রকাশ করতে চাইনা। জানিস তো নন্দগোপালবাবুকে নিয়ে এতো দিন কি ব্যস্তই না ছিলাম ? ভিয়েনা থেকে ডাক্তার এলো।

—ফল কিছু হল ?

—বিফল একেবারে হয়নি। উনি বললেন, সময় অনেক লাগবে, ভাল হয়েও যেতে পারেন, তবে ঠিক করে তিনিও কিছু বলতে পারলেন না ; আশা এখনও ছাড়িনি।

—উনিও আশা দিতে পারলেন না ?

—বললাম তো একেবারে নিরাশ করে দেন নি।

—চেষ্টা করে যা, সুফল পেতেও পারিস।

—তুইও তো এর মধ্যে একদিন যেতে পারতিস।

—আমার চাকরীর অবস্থা তো জানিস ভাই ; একেবারে সময় পাই না, না-মরা পর্যন্ত বোধ হয় আমাদের ছুটি নেই। শুধু নন্দ-গোপালবাবুর জন্যেই আমি কয়েকটাদিন তোকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিলুম। আরও একটা কারণ ছিল, ঐ শয়তানটাকে উপযুক্ত

পুরস্কার না দেওয়া পর্যন্ত মনে একেবারেই শান্তি পেতাম না। তার পর মিলাদেবীর খবর কি? মানে তোর মানস সুন্দরীর সংবাদ?

—ওকথা বলে আর লজ্জা দিচ্ছিস কেন?

—সত্যিকথা বলতে আমার মুখ কোনদিন পশ্চাৎ অপসরণ করে না।

—সে ভালই আছে।

—ব্যাস, আর কোনও খবর নেই; শুধু ভাল আছে?

—হ্যাঁ, নন্দগোপালবাবুর সেবায় খুব ব্যস্ত।

—আর তোর?

—হ্যাঁ, আমার সেবা চলেছে ফাঁকে ফাঁকে।

—এই পর্যন্ত?

—হ্যাঁ; আর কিছু না!

—তুই আমায় নিরাশ করলি সুজন। চিরকালটা তোর একভাবে কাটলো।

—কি আর করি ভাই!

—এবার বিয়ে করে ঘর বাঁধ, আমাদের মত।

—সকলের বরাতে কি সব হয়?

—তোর ঐ বরাত, কপাল, ঐ কথাগুলো বাদ দে তো। ওগুলোকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না। ওসব আমরা সেকেলে অবলা মেয়েদের শিখিয়েছিলুম, আজকের দিনে ওগুলো একেবারেই অচল, একেবারে সেকেলে। এখন আর ওগুলোয় কেউ বিশ্বাস করে না।

—তবে কি করবো, ব'লে দে।

—আমি বলে দিলেও তুই কিছু করতে পারবি না, কাজেই বলে লাভ নেই। যা ভাল বুঝবি, করবি। সুবিমলকে জেলে পাঠাতে হবে, একথা আমি বলে দেওয়ার পর তুই কাজে নেমেছিলি? সকলেই নিজের তাগিদে কাজ করে যায়। তোর যদি তাগিদ আসে তুইও ঠিক রাস্তায়ই চলবি, সহযোগিতা করতে পারি এই পর্যন্ত; যেমন সুবিমলকে পুরস্কার দেওয়ার জন্যে করলুম।

—বেশ ! আজ তবে চলি ?

—এলি-বা কেন ? আর চললি বা কেন ? এক মুহূর্তও কি তোর বসার সময় নেই ?

—না ভাই, শিল্পগঠনীকে আবার গড়ে তোলার ইচ্ছে আছে।

—ইচ্ছে আছে। ইচ্ছে সফল হবে, ও কাজটা একঘণ্টা পরে করলেও চলবে। সারাদেশের মেয়েদের সমস্যা ওতে মিটবে না।

—কিছুটা তো মিটবে।

—তা মিটতে পারে।

—সেটুকুই করতে চেষ্টা করি।

—বেশ তাই কর; একবার যখন মুখে এনেছিস, তখন আর তোকে আটকে রাখার সাধ্য আমার নেই। যা, আবার সময় পেলেই আসিস। আবার ডুব দিসনি যেন।

—আসব।

সুজন দীপকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে এলো।

এতদিন পরে সুজন নিজেকে একা পেল; জীবনের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান হাতড়ে নিজেকে যাচাই করার চেষ্টা করলো সে। সুজন দেখলো সে নিজের ক্ষতির চেয়ে, দিয়ে পেয়েছে অনেকখানি। এই দেওয়াতে যে আনন্দ, সেই আনন্দে সে নিজেকে আনন্দিত রেখে কাজ করে গেছে। বাহ্যিক পাওয়া তার হয় তো কিছুই হয়নি; কিন্তু মনটা তার ভরে গেছে। মনের দু-কুল ছাপিয়ে উবছে পড়ছে পাওয়ার বন্যা। যৌবনের প্রথম প্রহরে সে চেয়েছিল মিলাকে, পায়নি; কিন্তু মিলাও জীবনে কিছুই পেল না সুজনের চাওয়ায় সাড়া না দিয়ে। সুজন মিলাকে অভিন্ন দেখেছিল, তাই তো মনের ভাষা মুখের ভাষায় ব্যক্ত করেনি। আর মিলা সে শুধু মুখের ভাষাকেই বড় করে দেখেছিল তাই তো মনের ভাষার মূল্য দেয়নি জীবনে। এখন অনুতাপে তার হৃদয়টা জ্বলে যাচ্ছে; মনে মনে নিশ্চয় ভাবছে, কি ভুলই না সে করেছে এই মনের ভাষা না বোঝার ভাণ

করে। লোভ মিলাকে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল তা মিলাই মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। নিঃস্ব হয়েছে সে, কিন্তু সুজনের বাহ্যিক পাওয়া হয়নি ঠিকই, কিন্তু এতদিন পরেও মিলাকে মনের মাঝে পেয়ে ধন্য সুজন। আর বুঝি মিলাও।

নন্দগোপালকে তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সুজন যা কিছু করেছে, তাতে সুজনের বাইরের পাওয়া কণামাত্রও পূর্ণ হয়ে উঠলো না, কিন্তু সকলের পাওয়া এক হয়ে সুজনের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠলো পরিপূর্ণরূপে। সুজন হল সকল পাওয়ায় ধন্য। সুবিমল গেল, সমাজের একটা বড় পাপ মুছে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। মিলার কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হল তার। এবারেও তার অনেক কিছু পাওয়া হয়ে গেল। সবার মাঝে সুজন যা পেল, তা অনেক।

নির্জনে একা একা আজ সুজনের মিলার কথাই বড় বেশী করে মনে হতে লাগলো। মিলাই তার চিন্তার বেশীরভাগ অংশ দখল করে রইল। যৌবনের প্রথম দিনগুলো আজ আবার বড় করে মনের মাঝে দোলা দিতে লাগলো। বিবাহিত মিলার মাঝে কুমারী মিলাকে খুঁজে চলল সুজন। শিল্পসংগঠনীকে তার মনে পড়ে গেল। মিলা আর সুজনের যুগ্ম প্রচেষ্টার মাঝে মিলার ছোটখাট কথা আজ বড় হয়ে উঠলো ; মনে পড়লো মিলাকে সঙ্গে নিয়ে সুবিমল রায়ের বাড়ীতে সুজনের প্রথম পদক্ষেপ।

আবার আতঙ্কে কেঁপে উঠলো সে।

বাইশ

মিলাকে আজ নির্জনে নিশ্চিন্তে পেয়ে সুজন নিজের না-বলা অনেক কথাই বলতে চাইল। কোনওদিনই সুজন নিজের কথা তো কাউকে বলেনি, আজ হঠাৎ সে নিজের কথা বলবে কেমন করে, এই চিন্তাই সুজনের মাথার মধ্যে জোট পাকাতে লাগলো। মিলাকে বলতে গিয়েও বলতে পারলো না সে প্রথমেই আপন মনের জমাকরা

কথাগুলো। সুজন ভাবলো, মিলা কি ভাববে, হয়তো ছোটকরে দেখবে তাকে, হয়তো আর পাঁচ-জনের মত অতি-সাধারণ ভাববে সুজনকে, নয় তো সুজন শুধু আত্মচিন্তায় বিভোর ভেবে মিলার কাছে ছোট হয়ে যাবে। মিলাকে কাছে পেয়েও সুজন মুক হয়ে রইল। মৌন ভাঙ্গল না কিছুতেই। বারবার বলার জন্যে মনকে শক্ত করে আবার নিজেই নরম হয়ে ঐসব অশুভ চিন্তায় মগ্ন হল সে।

মিলা আপন মনে গুনগুণিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটা কলি গেয়ে চলেছিল। ভাব ভাবনার ঊর্ধে তখন এক কাব্যলোকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, পার্থিব চাওয়া-পাওয়া তখন মিলার মনকে পঙ্গু করে রাখেনি। সুজন কেমন করে মিলার এ-কাব্যময় প্রাণে বাস্তব এনে ছন্দপতন ঘটাবে ভেবে পেল না। যতই সে ভাবার কথা ভাবতে লাগলো, ততই তার মিলাকে বলার আসল সুত্রটা গেল কেমন যেন গোলমাল হয়ে।

নিজের চিন্তা থেকে সে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এ বলার প্রথম সুত্রটা খুঁজে পেল না।

নিজের কথা ভুলে সুজন শুরু করলো সকলের কথা, বললো—মিলা, এসো আবার আমরা শিল্প-সংগঠনীকে গড়ে তুলি, যেমন করে যৌবনের প্রথম দিনগুলোয় পূর্ণ প্রেরণা ছিল আমাদের গড়ার পেছনে। এসো আমরা আবার তা সংগ্রহ করি অন্তর দিয়ে। ঐ সংগঠনীটা ছিল আমাদের প্রাণ, তাকে ভুলি কেমন করে? ভুলতে যে পারিনা, ভুলতে চাইও না। যখন লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে পথের উপর হেঁটে যাই, সংগঠনীর দরজার তালাটা চোখে পড়ে, আজও চোখ ছল্ ছল্ করে উঠে; অতীত দিনগুলোকে মনে পড়ে যায়; মনে মনে ভাবি যৌবন তো এখনও আছে; যৌবনের কোঠা তো এখনও শেষ হয়ে যায়নি, তবুও কেমন যেন বুড়িয়ে গেছি আমরা। আসলে মনটাই আমাদের বুড়িয়ে গেছে বেশ খানিকটা—সুবিমলের তৈরী কঠিন সমস্যার মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে। কিন্তু একটা সমস্যা

তো এখন শেষ হয়ে গেছে। আকাশের কালো মেঘটা তো অনেকখানি সরে গেছে। তার নিকষ-কালোকরা অন্ধকার তো অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবু এখনও সূর্যের আলো দেখা দিলো না, নন্দগোপালবাবুর মানসিক মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সূর্যের আলো আমাদের চোখে তো ধরা দেবে না ; কিন্তু আমরা পেছিয়ে পড়বো কেন ? চলমান পৃথিবীর প্রগতির তালে পা ফেলতে কুণ্ঠা আসবে কেন ?

—আমার তো কোন কুণ্ঠাই নেই ; আমি তো চলতে প্রস্তুত, তবে একা চলার সামর্থ্য আমার নেই, আমায় পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সুবিমল আমায় অন্ধ করে দিয়েছে।

—তুমি রাজী আছো মিলা ?

—হ্যাঁ।

—বেশ, তবে এসো, আবার আমরা অতীতের রঙ্গীন দিনগুলো আমাদের জীবনে ফিরিয়ে আনি, ব্যপ্ত করে দিই নিজেদের সকলের মাঝে।

—তাই কর। এই একঘেয়ে জীবনটা যেন থিথিয়ে গেছে। অচল হয়ে পড়ছি ক্রমশঃই। চলার তাগিদ যে আছে, তাও প্রায় ভুলতে বসেছি। এমনি করেই যদি আরও কিছুকাল এই বদ্ধ ঘরের চারটে দেওয়ালের মাঝে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকি আমিও উন্মাদ হয়ে যাব—অতীতকে ভেবে ভেবে, ব্যর্থতার হতাশায়।

—ব্যর্থতা, হতাশা, কোথায় মিলা ?

—তুমি বুঝবে না, নিজেকে নিয়েই শুধু মগ্ন থেকো না, সকলের কথাই সকলের মন নিয়ে ভাবতে চেষ্টা কর, বুঝবে। কোথায় আমার আঘাত, কিসের জ্বালায় আজও আমি সব পেয়েও সব-হারাদের একজন।

—বুঝেছি মিলা।

—সেই বোঝ, তবে দেরী করে ফেল খুব বেশী।

—তার জন্যে অনুতাপ করতে তুমি কি উপদেশ দাও ?

—না, অনুতাপ তুমি করো না লক্ষ্মীটি, আমার মত আর কাউকে, অনুতাপের আগুনে জ্বলে মরতে হয়, এ আমি চাই না, বিশেষ করে তুমি কোনও কাজে বা কথায় অনুতপ্ত হও এ আমি সহ্য করতে পারবো না।

—সংগঠনীর কাজ কি আবার শুরু করে দেব ?

—নিশ্চয়, এখুনি, আরও দেরী করে আমায় আর অচল করে দিয়ো না।

এতক্ষণ সুজন সকলের কথা বলে গেল সংগঠনীকে কেন্দ্র করে, কিন্তু নিজের কথাগুলো আবার মনের দরজায় টোকা মেরে চললো ; সুজন আর নিজেকে সংযত করতে পারলো না কিছুতেই ; আজ সে সব-ই বলবে মিলাকে। কোনও কিছুই গোপন করবে না সে মিলার কাছে। সকল চাওয়ার মাঝে আপন চাওয়ার কি কোনও দাম নেই ? নিশ্চয়ই আছে। মনের মাঝে দ্বন্দ চলল সুজনের জোর তালে ; এ দ্বন্দে সকল পাওয়া পরাস্ত হল বারবার। সুজনের নিজের কথা, যা নিয়ে সে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চিন্তা করেও কোনও কূলের সন্ধান পায়নি। যার মধ্যে সে মুক্ত-আকাশের নির্মল সূর্যালোক দেখেনি কখনও কোনওদিন, তা আজ সুন্দর ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। নির্মল আলো যেন ঝল্‌মল্‌ করে আপন কথা বলার মাঝে, সুজন অনুভব করে মনে মনে।

দীপকই তাকে নতুন করে ভাবার জন্যে সুজনের মনটাকে প্রস্তুত করে দিয়েছিল, শুধু একটা কথা বলে,—"তোর মানস-সুন্দরীর সংবাদ কি ?" সত্যই তো মিলা সুজনের মানস-সুন্দরী, তাকে তিল তিল করে তিলোত্তমার মত সুজন যুগ যুগ ধরে মনের মাঝে গড়ে তুলেছে একান্ত আপন করে।

এতদিন পরে সুজন নিজের কথাই বল্‌ল, সবার কথা ভুলে গিয়ে,—মিলা একটা কথা বলব ? যদি অনুমতি দাও।

—বল না, কোনওদিন কি কোনও কথায় বাধা দিয়েছি তোমায় ?

সুজন বলে চললো,—আমাদের দু-জনকে পরস্পর দেখার প্রথম দিনটা তোমার মনে পড়ে মিলা? সেদিনের কথা একবার মনে কর; আমাদের বাড়ীর ভাঙ্গা মন্দিরটা হয়তো তোমার মনে আছে। সেদিন যখন তোমাতে আমাতে সেই ভাঙ্গা মন্দিরটার পাশে বসে শিল্প-সংগঠনী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলুম। সেদিন থেকে আমার মনের মণিকোঠায় তোমাকে নিয়ে একটা ঘর বাঁধবো এ ছিল আমার একান্ত কামনা। মনের মাঝে সে স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন হয়েই লুকিয়ে ছিল না, ভেবেছিলাম তা বাস্তবে রূপান্তরিত হবে ধীরে ধীরে। তারপর সুবিমল রায় কালো মেঘের মত আমাদের জীবনের সব বসন্ত আড়াল করে ঢেকে দিল। নবীন বসন্তের আমার মুকুলিত কামনা সেদিন হঠাৎ বজ্রপাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সহ্য করতে পারলাম না, চলে গেলাম তোমাদের রেখে—সহর থেকে দূরে এক নির্জন পাড়াগাঁয়ে। সেখানে নির্জনে একা একা বসে শুধু তোমার কথা চিন্তা করাই ছিল আমার একমাত্র কাজ। আস্তে আস্তে তোমায় পাওয়ার বাসনা এমন সুতীব্র হয়ে উঠলো, যে অভিমান গেল ধুলোয় লুটিয়ে, ভুলে গেলুম সুবিমলের কথা; ছুটে এলুম এখানে।

—তারপর!

—তারপর যা হল, তা তো তোমার কাছে গোপন নেই মিলা। তোমার সন্ধানে যাযাবর-জীবন হল আমার জীবনের আদর্শ, তোমায় খোঁজা শুরু হয়ে গেল। এসো আমরা আবার শিল্প-সংগঠনীর কাজ শুরু করে দিই। একা আমিও না, আর একা তুমিও না, এসো দু-জনে। দু-জনে থাকবো একই সুরে বাঁধা। তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধবো; অনেকদিনের পুরোন স্বপ্ন আমার সত্যে মুকুলিত হবে। মিলা, বল আমার এ একান্ত কামনা তুমি সার্থক করে তুলবে? দ্বিধা করবে না কোনও? অনেকদিনের আশা আমার সার্থক হয়ে উঠবে তো?

—তা কেমন করে হয়?

—হয়; কেমন করে হয় তা জানিয়ে দিই আমরা। আমরাই তার পথপ্রদর্শক হই; যা হয়নি, তা যে হয় না, এ মিথ্যাকে আমরা সত্য বলে মানবো না, আমরা জানি, এ মিথ্যা নয়, এ সত্য। সত্য অস্বীকার করে নিজেদের আমরা ছোট করি কেন? নতুন সমাজের প্রথম নাগরিক হব আমরা। সত্যের অমর্যাদা করে মিথ্যাকে নিয়ে আঁকড়ে থেকে লাভ কি? মন থেকে তে আমরা সত্যকে মিথ্যা বলে চালিয়ে দিতে পারবো না। মিলা, বল, আমায় প্রত্যাখ্যান করতে তুমি পারবে না, গ্রহণ করলে আমায়; আমায় তুমি ধন্য করলে?

—তা হয়না সুজন; তুমি ভুল বুঝেছ।

—কেন হয় না? মিলা, এ পৃথিবীতে সবই হয়; ভুল আমি বুঝিনি, আমি ঠিকই বুঝেছি, যা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছি; তাকেই গ্রহণ করতে চাই।

—আমি আমার অধ্যাপক স্বামীকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি; তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারবো না, সুজন তুমি আমায় ক্ষমা কর।

মিলা আজ আবার আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো,—ঠিক যেমন করে কেঁদেছিল, সুবিমলের বিদায় দেওয়ার কালে—আর সুজনের কাছে তার অতীত জীবনের সমস্ত গোপন কথা বলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর।

সুজন স্তম্ভিত নির্বাক। এরপর আর কোনও কথা সুজন বলতে পারলো না, বলার ক্ষমতা তার শেষ হয়ে গেছে। আলোয় আলোময় এই পৃথিবীটায় অন্ধকার নেমে এসেছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। সুজন ভাবে তারই মত মানুষ বন্ধনে থাকতে চায় মোহগর্তে। সুখাসক্তির সম্মোহবসে সে উঠতে চায় না, চলতে চায় না সহজে।

এই গতির বিশ্বে অচলতাকে আঁকড়ে ধরে অনর্থ ঘটাতে চায় অহরহ। সুখ-দুঃখের আশা নৈরাশ্যময় এই আটপৌরে

জীবনে অতি অল্পই পাওয়া যায়। আঘাত আসে আমাদের জীবনে, জীবনকে বিড়ম্বিত করে তোলে, সুখ-শান্তি-আশা কোথায় মিলিয়ে যায়। ভাব বা আদর্শ, তা সে যতই বড় হোক না কেন, জীবনে যতক্ষণ না সাধারণ স্বাভাবিক হয়ে দেখা দিচ্ছে, ততক্ষণ তার কোন প্রাণ নেই, প্রেরণা নেই। প্রেরণা সুজনের শেষ হয়ে গেছে ; থেমে গেছে সে ; আত্মযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তাকে আসতে হল এই স্থিতির জীবনে ; নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে সময় লাগলো অনেক। ধীরে ধীরে সে মোহ থেকে প্রেমে উপনীত হল ; মোহের পথ পার হয়ে প্রেমচেতনার মুক্তি পথে সে অগ্রসর হল এবার। প্রেমকে সুজন গ্রহণ করলো— জীবনের মোহজাত দুঃখবেদনা শোক সন্তাপের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে পথ চিনে চিনে। সুজন এই দুঃখ বেদনার আড়ালে নবজীবনের আনন্দে উদ্দীপ্ত হল আস্তে আস্তে।

এই পৃথিবীতে শুধু শোক-দুঃখ, অভাব-অভিযোগই নেই ; আছে সুরময় হৃদয়মহিমার প্রেম, আছে গান ; আছে কাজ। সে আত্মার বস্তুবুদ্ধি থেকে রসোপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছে আজ। তার জীবনে সুর প্রেমও যেমন সত্য ; বস্তুবিশ্বের স্থূলত্বও তেমনি সত্য।

সুজন কাজ করে যায় ; এ কাজের মধ্যেও সে প্রাণের ছোঁয়া পায় ; কাজই তাকে বাঁচিয়ে রাখে, সরিয়ে রাখে সুজনকে ভাব-জগতের সুরের বন্ধন থেকে দূরে। কাজে প্রেরণা আসে ধীরে ধীরে, এতেও সে প্রেমের স্পর্শ পায়, আপন গণ্ডি থেকে মুক্ত হওয়ার পথ দেখতে পায় ; আপন চাওয়া তাকে আর আঘাত হানে না, সে মুক্ত করে দেয় নিজেকে আপন চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে। সকলের মাঝে সে খুঁজে পায় নিজেকে। সকলের কাজে সে নিজের কাজ দেখতে পায় ; ছোট আমি ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে বড় আমিতে। এর জন্যে তার অবচেতন মন আনন্দ পায় অনেক, অনেক বেশী : আত্মচিন্তা আর তাকে পেয়ে বসে না, সে আত্ম-

চিন্তার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। সুজন মিলাকে ধন্যবাদ দেয় মনে মনে, মিলাই তো তার আত্মচিন্তার মূলে আঘাত হেনে তাকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মিলাই তো সুজনকে মুক্তি-পথের সন্ধান দিয়েছে—আঘাত দিয়ে তাকে। এ আঘাত এখন অমৃত-রসে সুজনের মনকে ভরিয়ে তুলেছে।

তবু মিলা আজও কাঁদে; কেন কাঁদে সুজন জানে না, মিলার দেওয়া আঘাত তো, সুজনকে নতুন জীবনের ইঙ্গিত দিয়ে গেল; মিলা কি তা বুঝে না? হয়তো এই সত্যি, মিলা আজও বোঝে না, সুজন বার বার বোঝাতে গিয়েও ফিরে আসে, ভাষার মধ্যে দিয়ে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারে না—এ হৃদয়োপলব্ধির কথা। তাই তারও বলা হয় না।

মিলাও কাজ করে যায়, তবে তার হৃদয়টা যেন এ কাজের মধ্যে নেই। রক্ত মাংসে গড়া এ দেহটা ধীরে ধীরে কাজ করে চলে। এ কাজের মধ্যে প্রাণের স্পর্শ যে নেই তা মিলাও বোঝে; তবু নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারে না। দেহ আর মন ঠিক একই পথে চলে না, দু-টোর দিক যেন ভিন্ন।

শিল্প-সংগঠনা আবার চলতে আরম্ভ করেছে; সুজনের প্রাণময় চেষ্টায় সংগঠনীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সুজনও মিলার মত কাজ করে যায়। যৌথ প্রচেষ্টার মাঝে আত্মচিন্তা নেই কারও, বিশেষ করে সুজনের।

মিলা এখনও সুজনের কথা ভাবে।

সুজন ভাবে কিনা ঠিক বলা যায় না। কারণ তার কাজের তাগিদ এত বেশী যে, ভাবার মাঝে অতীতের স্মৃতির বেদনায় তার দেখা পাওয়া ভার। অতীতের বা ভবিষ্যতের স্বপ্ন-চেতনার সৌভাগ্যে সে আজ দেখা দিল না।